লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ২৪তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ৮ জিলক্বদ, ১৪৪১ হিজরি | ৩০ ইহ্‌সান, ১৩৯৯ হি. শা. | ৩০ জুন, ২০২০ ঈসাব্দ

Ahmadiyya Central Mosque in Saltpond, Ghana

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

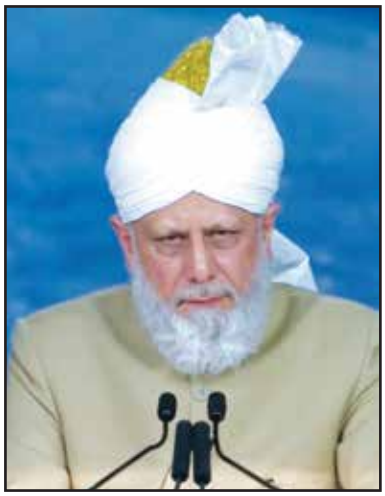

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুন নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

মসজিদ হোক নিষ্কণ্টক জমিতে

"আমার বাড়ীর ঈশান কোণে ছোট্ট মসজিদ ঘর, সেই ঘর থেকে ভেসে আসে আল্লাহু আকবার।" আল্লাহ্ তা'লার উপাসনা করার জন্য মহানবী (সা.) মদীনায় প্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তা মসজিদে নববী নামে সুখ্যাত। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর **'কুসওয়া'** নামক একটি উটে চড়ে উক্ত মসজিদে নববীর জায়গায় আসেন। উটটি আল্লাহ্‌র বিশেষ ইশারায় যে স্থানে বসে পড়েছিল সেই জমিটি ছিল মদীনার দু'জন এতিম বালকের। আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) সিদ্ধান্ত দিলেন– এখানেই হবে ইসলামের প্রথম মসজিদ। উক্ত স্থানটি বালকদ্বয় বিনামূল্যে উপহার হিসেবে দিতে চাইলেও মুহাম্মদ (সা.) মুল্য পরিশোধ করে তবেই সেখানে মসজিদের ভিত্তি রেখেছিলেন আর বলেছিলেন, **"ইন্না মাসজিদি হাযা আখিরুল মাসাজিদ"** অর্থাৎ আমার এই মসজিদই শেষ মসজিদ। যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করতে হয়, তাহলে আমার আদর্শ অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এখানে আমরা দু'টি শিক্ষা পাই আর তা হল, মসজিদ নির্মাণে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হবে এবং এমন নিষ্কণ্টক ক্রয়কৃত জমি হতে হবে, যেখানে ভবিষ্যতে অন্য কেউ জমির মালিকানা দাবি করতে পারবে না। হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি পাখির বাসা পরিমান ছোট মসজিদও নির্মাণ করবে, জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে'। মহানবী (সা.)-এর এমন অনেক হাদীস আছে যেখানে মসজিদ নির্মাণের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে ফজিলত দৃষ্টিপটে রাখা হলেও মসজিদে নববী নির্মাণের প্রেক্ষাপট অনেকের জানা থাকে না। ফলে একটা সময় নির্মিত মসজিদ জায়গার মালিকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, এমনকি জমির মালিক অমুসলিম হলে মসজিদ গুঁড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। এর ফলে বড় ধরনের সংঘাতের সম্ভাবনা দেখা দেয় অথবা নিরুপায় সাধারণ মুসুল্লিরা মনোকষ্ট পেলেও বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। উপমহাদেশে এমন অনেক মসজিদ আছে যেগুলোর জমি নিষ্কণ্টক না হওয়াতে পরবর্তীতে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মসজিদ কেটে দু'ভাগ করা হয়েছে, এমনকি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈধ জমি যদি ব্যবহার না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে উক্ত মসজিদের যে কোন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য নির্মাণকারীরাই দায়ী কারণ, তারা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ওপর আমল করে মসজিদ নির্মাণ করে নি। মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক যেমন– কোন সড়কের ওপর যেন মসজিদ নির্মাণ না করা হয়, এর ফলে মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটবে এবং মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণতম ধর্ম, মানবতার ধর্ম। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা বহির্ভুত কোন কাজ করে ইসলামের সেবকও হওয়া যায় না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও অর্জন করা সম্ভব হয় না।

সূচিপত্রে

৩০ জুন ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জুন, ২০২০ মোতাবেক ১২ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** ৬

সংঘাতময় বিশ্বে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা যুক্তরাজ্যের ১৪শ জাতীয় পীস সিম্পোজিয়ামে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া *মুসলিম জামা'তের বিশ্বজনীন ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত মূল ভাষণ* ১৫

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা ২৩

তাঁর সারাজীবন– তাঁর সারা পৃথিবী ২৭
মাসুম আহমেদ কুরাইশী

রহমতুল্লিল আলামীন খাতামান নবীঈন (সা.) ৩১
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

কবিতা: ৩২
আযানের ধ্বনি
আনহার বেগম (পারভিন)

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি– **pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭। আর তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল।

قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸﴾

১৮। তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে (দূরে) চলে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিষপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন এক নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা যত সত্যবাদীই হই না কেন তুমিতো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না[১৩৬৬]।'

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯। আর তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল। সে বললো, 'বরং তোমাদের মন এ (জঘন্য পাপ) কাজ তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছে[১৩৬৭]। সুতরাং (এখন) উত্তম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়) এবং তোমরা যা বলছ এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।'

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০। আর (সেখানে) এক কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি উত্তোলনকারীকে পাঠালো। আর সে তার বালতি (কূপে) ফেললো। সে (কাফেলার লোকদের) বললো, 'সুসংবাদ! এ যে এক কিশোর বালক'! তারা তাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে[১৩৬৮] লুকিয়ে রাখলো। আর তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿۲۱﴾

২১। আর তারা তাকে কয়েক দিরহামের নগণ্য মূল্যে বিক্রী করে দিল এবং তাকে দিয়ে তারা বেশি লাভবান হতে আগ্রহী ছিল না।[১৩৬৮-ক]

১৩৬৬। তাদের বাহানা মনের দুর্বলতাকে ফাঁস করে দিল এবং অপরাধী-মনের চিহ্ন তাদের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

১৩৬৭। এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর পুত্রদের বর্ণনাকে একটি ভিত্তিহীন বা মিথ্যা গল্প বলে ধরে নিয়েছিলেন।

১৩৬৮। মরুযাত্রীদল হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মহামূল্যবান পণ্য হিসেবে সতর্কতার সঙ্গে নিয়ে চললো।

১৩৬৮-ক। 'ফীহি' শব্দের অর্থ 'তাকে' অথবা 'এটা', যা ইউসুফ (আ.) অথবা মূল্য উভয়কে ইংগিত করে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেনটারী দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

হাদীস :

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁর (সা.) নিকট এক ব্যক্তি আসল, তার কাপড় খুব সাদা ছিল। চুল ছিল কালো। সে মুসাফির ছিল না এবং কেউ তাকে চিনতোও না। তিনি এসে মহানবী (সা.)-এর হাঁটুর সাথে তার হাঁটু মিলিয়ে আদবের সাথে বসলেন। অতঃপর বলতে আরম্ভ করলেন, "হে মুহাম্মদ (সা.) ঈমান কি?" তিনি অর্থাৎ হুযূর (সা.) বললেন, "ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, পরকালের উপর এবং ভাল ও মন্দ তকদীরে বিশ্বাস রাখো।" *(তিরমিযী)*

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকে সেই ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। প্রথমত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছুর চেয়ে তার প্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত সে কাউকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসে। তৃতীয়ত সে কুফরী হতে বের হয়ে আসার পর আবার কুফরীতে প্রত্যাবর্তন তেমনিই অপ্রিয় মনে করে যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপ্রিয় মনে করে।" *(বুখারী)*

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন. "আহলে কিতাবরা (ইহুদী) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাত। তাই রসূলে করীম (সা.) মুসলমানদের বললেন, 'তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর ঐসব হেদায়াতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি– যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাদের রবের তরফ হতে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা-মুসলমান।" *(বুখারী)*

অমৃতবাণী

এ যুগই মাহদী ও মসীহ্‌র আবির্ভাবের যুগ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত আর দুঃখ ও আক্ষেপে তাদের মন ভারাক্রান্ত। তারা অতীতের সব সমস্যা এবং অত্যাসন্ন সব বিপদাপদকে ভুলে বসে আছে। তারা বৃষ্টিবাহী সুবাতাসের আশা করে ঠিকই কিন্তু নোংরা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। অতএব এর চেয়ে বড় আর কোন্ বিপদকে দাজ্জাল আখ্যায়িত করা যেতে পারে? লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে আর বিপদাবলীও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা সেই গাধা দেখেছি যার ওপর ভর করে তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আর সে গাধা নিজ খুরের জোরে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেয়। দৃষ্টিবান মানুষ জানেন, সে বছরের পথ মাসে আর মাসের পথ একদিনে বা দু'দিনে অতিক্রম করে যা ভ্রমণকারীদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে। এটি দ্রুত বেগে পথ অতিক্রমকারী একটি বাহন যার সাথে কোন যান বা অন্য কোন বাহন প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এর জন্য রাস্তাঘাটের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে আর তার আবির্ভাবের মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান কমে গেছে। গর্ভবতী উটনীকে নিষ্কর্মা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুস্তকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরম্ভ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রান্তগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক্ত হয়েছে। একে দ্রুতগতির বাহন হিসেবে আর ব্যবহার করা হয় না। এটা দাজ্জালের সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্ তা'লা একে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে কাজে নিয়োজিত করেছেন আর এতে আপত্তির কিছু নেই। এ ধরনের বাহনগুলো দীর্ঘকাল থেকে চলছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন বাহন নেই। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতএব প্রমাণিত হল, এটিই মাহদী ও যুগ মসীহ্‌র আবির্ভাবের সময়, কেননা ভ্রষ্টতা সর্বত্র ছেয়ে গেছে এবং পৃথিবী অশান্তিতে ভরে গেছে। বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে আর বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের হট্টগোল অনেক বেড়ে গেছে। কুরআনে শেষ যুগের যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর প্রত্যেকটি চক্ষুমানদের জন্য প্রকাশিত হয়েছে।

যারা আরব বা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে মাহদীর আগমনের অপেক্ষা করছে তারা মস্তবড় ভুল করছে। তাদের চিন্তা সঠিক নয়, কেননা আরব দেশগুলো এমন যাকে আল্লাহ্ তা'লা অশান্তি, নৈরাজ্য ও যুগ-কাফেরদের সৃষ্ট সব বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে দেশে ভ্রষ্টতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও মাহদীর আগমনের আশা করা যেতে পারে না। মহাপ্রতাপান্বিত খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের জন্য বিশেষত্ব রাখে।

এখানে ধর্মত্যাগের দ্বার খুলে গেছে, সব ধরনের অনাচার, কদাচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, এ দেশই মহা সম্মানিত ও শাক্তিশালী খোদার সাহায্য লাভের এবং তাঁর পক্ষ থেকে মাহদীর আগমনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র কসম! ভারতে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখছি এর উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না। আর খ্রীষ্টানদের সৃষ্ট এই নৈরাজ্যের মত অন্য কোন পরীক্ষার সম্মুখীনও আমরা হই নি। সহীহ্ হাদীসে আছে, দাজ্জাল প্রাচ্যের দেশ থেকে আবির্ভূত হবে। আর কুরআনও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সে দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং আমাদের জন্য এসব প্রমাণিত ও স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক আর আমরা অস্বীকারকারীদের না মানার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি না।

['সিররুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃ: ৬২-৬৪]

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জুন, ২০২০ মোতাবেক ১২ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

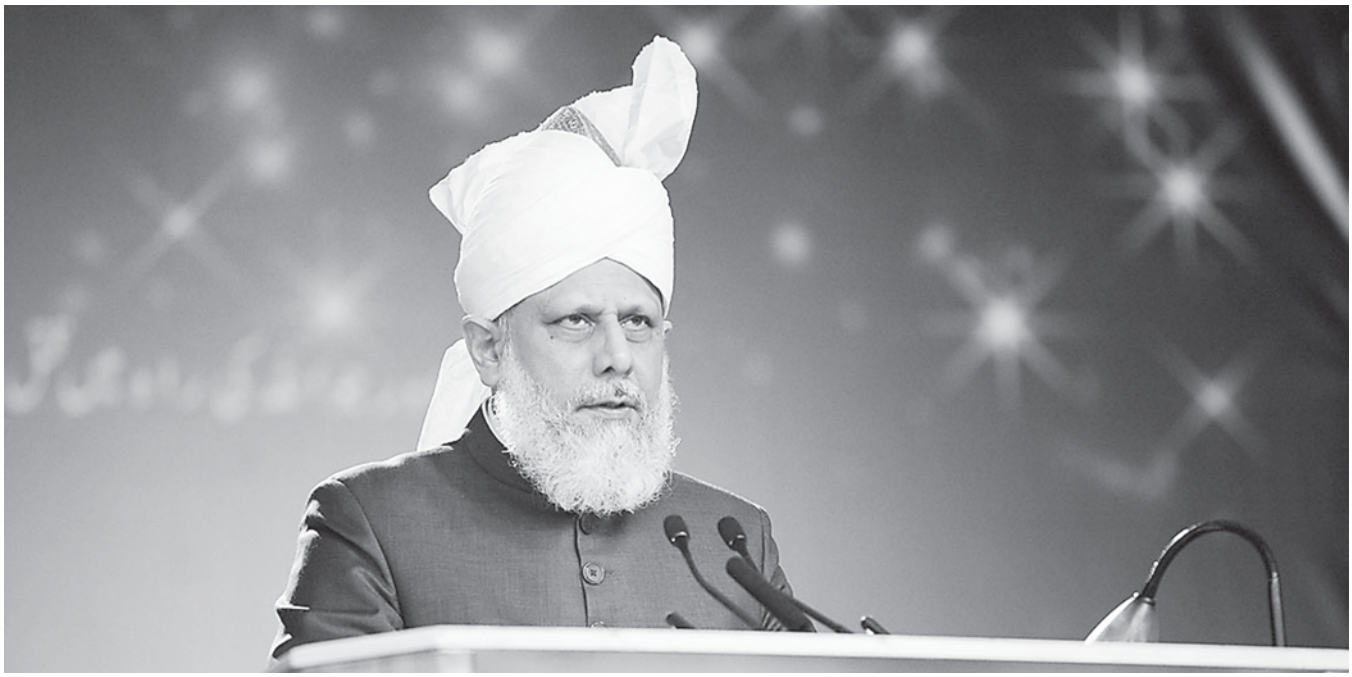

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব সাহাবীর (রা.) স্মৃতিচারণ করব তাদের একজন হলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন আমর আর তার মাতার নাম ছিল ফাতেমা বিনতে বা'জাহ্। তিনি আদি বিন কা'ব বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর উপনাম আবুল আ'ওয়ার ছিল, যদিও কেউ কেউ আবু সওত-ও বলেছেন। তিনি দীর্ঘকায়, গোধুম বর্ণবিশিষ্ট ছিলেন আর (তার মাথার) চুল ছিল ঘন। তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। তার বংশবৃক্ষ চতুর্থ পুরুষে নুফায়েল পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। এছাড়া অষ্টম পুরুষে কা'ব বিন লোই পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হয়। হযরত সাঈদ (রা)-এর বোন আতেকার বিয়ে হয় হযরত উমর (রা.)-এর সাথে আর হযরত উমর (রা.)-এর বোন ফাতেমার বিয়ে হয়েছিল হযরত সাঈদ (রা.)-এর সাথে। ইনি সেই বোন যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলেন। হযরত সাঈদ (রা.)-এর পিতা যায়েদ বিন আমর অজ্ঞতার যুগে এক খোদার উপাসনা করতেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসন্ধান করতেন আর বলতেন, যিনি ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রভু তিনিই আমার প্রভু এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর ধর্মই আমার ধর্ম। সে যুগেও একেশ্বরবাদী মানুষ ছিল। কতিপয় শিশুও প্রশ্ন করে থাকে যে, ইসলামের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর ধর্ম কী ছিল আর তিনি কার ইবাদত করতেন? (অতএব এর উত্তর হলো) মহানবী (সা.) তো সবচেয়ে বড় একেশ্বরবাদী ছিলেন আর তিনি তখনও এক খোদারই ইবাদত করতেন। যায়েদ

বিন আমর সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা হতে, এমনকি মুশরেকদের জবাইকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করা থেকেও বিরত থাকতেন। মহানবী (সা.)-এর নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে একবার তাঁর (সা.) সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সহীহ্ বুখারীতে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি (সা.) যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সাথে বালদা নামক স্থানের নিম্নভূমিতে সাক্ষাৎ করেন অর্থাৎ এটি তাঁর (সা.) নবুওয়াতের দাবির পূর্বের কথা। বালদা হলো মক্কার পশ্চিমে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। মক্কার দিকে যাওয়ার সময় তানঈমের পথে এটি অবস্থিত। মহানবী (সা.)-এর সামনে দস্তরখান রাখা হলে তিনি (সা.) খেতে অস্বীকৃতি জানান। তখন যায়েদ বলেন, আমিও সেগুলো খাই না যা তোমরা তোমাদের প্রতিমার নামে জবাই কর, আর আমি কেবল তা-ই ভক্ষণ করি যার ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়। মহানবী (সা.) এই সাবধানতাবশত খান নি যে, এগুলো আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস। এতে যায়েদও বলেন যে, আমিও আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করা জিনিস বা পশুর মাংস ভক্ষণ করি না। রেওয়ায়েতের পরের অংশে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ বিন আমর কুরাইশদের কুরবানীকে ত্রুটিযুক্ত মনে করতেন এবং বলতেন, ছাগলকে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে এর জন্য পানি বর্ষণ করেছেন আর ভূমি থেকে এগুলোর জন্য ঘাস উদ্গত করেছেন অথচ তোমরা এগুলোকে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই কর! অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে জবাই করাকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং এটিকে অনেক বড় পাপ জ্ঞান করতেন। যায়েদ বিন আমর কুফর ও শির্‌ক এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের অন্বেষণে দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তার এই সফর সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে আরেকটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

হযরত ইবনে উমর বর্ণনা করেন, যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল সত্য ধর্মের সন্ধান ও অনুসরণের জন্য সিরিয়ার দিকে যান। সেখানে এক ইহুদি আলেমের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে তার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সেই ইহুদি আলেমকে তিনি বলেন, আমাকে (আপনাদের ধর্ম সম্পর্কে) বলুন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। সে বলল, আমাদের ধর্মের অনুসরণ করো না, কেননা এটি বিকৃত হয়ে গেছে, নতুবা তুমিও ঐশী কোপানলে পতিত হবে। যায়েদ বলেন, আমি তো আল্লাহ্‌র ক্রোধ এড়ানোর চেষ্টা করছি আর আমি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি কখনো সহ্য করতে পারব না, অধিকন্তু এটি সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন ধর্মের সন্ধান দিতে পার? সেই ইহুদি আলেম বলল, আমি কেবল এটিই জানি যে, মানুষের 'হানীফ' (তথা একত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, 'হানীফ' কী? সেই (ইহুদি) বলল, ইবরাহীমের ধর্ম, তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, তিনি কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন। এরপর যায়েদ সেখান থেকে বেরিয়ে একজন খ্রিষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাকেও তিনি একই কথা বলেন। সেই (খ্রিষ্টান আলেম) বলল, তুমি কখনো আমাদের ধর্মের অনুসরণ করো না, অন্যথায় আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতের শিকার হবে। যায়েদ বলেন, আমি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এড়ানোর চেষ্টা করছি, কেননা আমি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত এবং তাঁর কোপানল সহ্য করতে পারব না আর তা সহ্য করার শক্তিও আমার নেই। তুমি কি আমাকে অন্য কোন ধর্মের দিশা দিতে পার? সেই খ্রিষ্টান বলল, আমি শুধু এটিই জানি যে, মানুষের 'হানীফ' (তথা একত্ববাদী) হওয়া উচিত। যায়েদ জিজ্ঞেস করেন, 'হানীফ' কী? সেই ব্যক্তি বলল, ইবরাহীমের ধর্ম। তিনি ইহুদিও ছিলেন না আর খ্রিষ্টানও না, বরং তিনি কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন। যায়েদ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে তার মতামত শুনার পর সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর বাইরে খোলা মাঠে এসে তিনি তার দু'হাত তুলে দোয়া করেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি হযরত ইবরাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। যায়েদ বিন আমর মহানবী (সা.)-এর যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর (সা.) দাবির পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেছিলেন। হযরত আমের বিন রাবিআ বর্ণনা করেন যে, যায়েদ বিন আমর সত্য ধর্মের অন্বেষণে ছিলেন আর তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম আর প্রতিমা ও পাথরের পূজা করার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজ জাতির সাথে মতভেদ করেন আর তাদের প্রতিমা এবং তার পিতা-পিতামহরা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেন। এছাড়া তাদের জবাইকৃত পশুর মাংসও তিনি খেতেন না। একবার তিনি আমাকে বলেন, হে আমের! দেখ, আমার জাতির সাথে আমার মতের অমিল রয়েছে। আমি ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী এবং (তাঁর অনুসারী) যাঁর তিনি অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ইবাদত করতেন। আর এরপর আমি ইসমাঈল (আ.) এর অনুসরণ করি যিনি এই ক্বিবলার দিকেই মুখ করে নামায পড়তেন। আর আমি ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবীর আগমনের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁর সত্যায়ন, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁর সত্য

নবী হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমি তাঁর যুগ পাবো না। হে আমের! যদি তুমি সেই নবীর যুগ পাও, তাহলে তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। আমের বলেন, মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূত হন, তখন আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং মহানবী (সা.)-কে যায়েদ বিন আমরের বাণী ও সালাম পৌঁছে দেই। মহানবী (সা.) তার সালামের উত্তর দেন ও তার জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং বলেন, আমি তাকে জান্নাতে নিজের আঁচল গুটাতে দেখেছি। যায়েদ বিন আমর নিজের একেশ্বরবাদী হওয়ার জন্য অত্যন্ত গর্ববোধ করতেন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর অজ্ঞতার যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে দেখেছি যে, তিনি কা'বা ঘরের দেয়ালে হেলান দেয়া অবস্থায় বলছিলেন, হে কুরাইশরা! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি ভিন্ন তোমাদের মাঝে আর কেউ ইবরাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও। যায়েদ কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত কবরস্থ করতেন না। আরবের কতক গোত্রের রীতি ছিল যে, তারা নিজ কন্যাদেরকে জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলতো; তিনি এটি করতেন না, বরং তিনি যদি অবগত হতেন যে, কেউ নিজ কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে বলতেন, একে মেরো না, একে হত্যা করো না, আমি তোমার স্থলে এর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করব। অতঃপর তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। আর সে সাবালিকা হলে তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি আর তুমি চাইলে আমি তার সব দায়িত্ব সম্পন্ন করব, অর্থাৎ বিয়েশাদি প্রভৃতির খরচাদি বহন করব। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেন, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েত বুখারীর ছিল আর দ্বিতীয়টি ইতিহাসগ্রন্থ উসদুল গাবা-র রেওয়ায়েত। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণনা করেন যে, আমি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে কাবার সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলছিলেন, হে কুরাইশরা! সেই সত্তার কসম যার হাতে যায়েদের প্রাণ, আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! হায়, আমি যদি তোমার ইবাদতের পছন্দনীয় পন্থা জানতাম তাহলে আমি সেভাবেই তোমার ইবাদত করতাম, কিন্তু আমি তা জানি না। এরপর তিনি নিজ হাতের তালুতে সিজদা করতেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত, যায়েদ বিন আমরের মৃত্যু মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পাঁচ বছর পূর্বে হয়েছে, সে সময় কুরাইশরা কাবাগৃহের পুনঃনির্মাণ করছিল। তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি বলছিলেন, আমি ইব্রাহীমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল, প্রাসঙ্গিকভাবে তার পিতার বর্ণনা চলে এসেছে। পুত্র ইসলামে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন, কিন্তু পিতার পুণ্যের কারণে এটিও ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়ে আছে আর এ কারণে আমিও এখানে উল্লেখ করলাম, কেননা এসব রেওয়ায়েত বুখারীতেও রয়েছে। যাহোক এখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ করছি।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং তাঁর কাছে যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, অর্থাৎ হযরত সাঈদ এর পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ যায়েদ বিন আমরকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি কৃপা করুন, ইব্রাহীমের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর মুসলমানরা যখনই যায়েদ বিন আমরের উল্লেখ করত, তখন তার জন্য কৃপা ও মাগফিরাতের দোয়া করত। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-কে যখন যায়েদ বিন আমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি (সা.) বলেন, তিনি কিয়ামত দিবসে একা-ই এক উম্মতের সমমর্যাদা নিয়ে উত্থিত হবেন।

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত উমরের ভগ্নিপতি ছিলেন আর হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বোন আতেকা বিনতে যায়েদের বিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সাথে হয়েছিল। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এবং তার স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্তাব ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ প্রারম্ভেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তারা ঈমান আনয়ন করেছিলেন। যেমনটি পূর্বেই আমি বলেছি, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন হযরত সাঈদ (রা.)-এর স্ত্রী। গত এক খুতবায় এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত খাব্বাব বিন আরত এর স্মৃতিচারণে দেয়া হয়েছিল, তথাপি এখানে যেহেতু সাঈদ (রা.)-এর কথা আলোচনা হচ্ছে তাই আমি এখানেও সংক্ষেপে কিছুটা বর্ণনা করছি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে লিখেছেন,

হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কেবল কয়েক দিন অতিবাহিত হতেই, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে আরেকটি আনন্দের উপলক্ষ্য দান করেন অর্থাৎ ইসলামের কট্টর বিরোধী হযরত উমরও মুসলমান হয়ে যান। হযরত উমরের প্রকৃতিতে শুরু থেকেই কঠোরতা ছিল, কিন্তু ইসলামের শত্রুতা তাতে নুতন মাত্রা যোগ করেছে। যেমন, ইসলাম গ্রহণের

পূর্বে তিনি অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদেরকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে অনেক বেশি কষ্ট দিতেন। একদিন তিনি ভাবলেন, এদেরকে তো আমি কষ্ট দিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু এরা বিরত হচ্ছে না এবং নিজেদের বিশ্বাসে তারা দৃঢ়-অবিচল। এ নৈরাজ্যের হোতাকে শেষ করে দিলেই তো হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘর থেকে বের হন, তার হাতে ছিল নগ্ন তরবারি। পথিমধ্যে জনৈক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়; সে বলে, হে উমর! এত ক্রুদ্ধ হয়ে নগ্ন তরবারি হাতে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, আজ আমি মুহাম্মদের (সা.) ভবলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলে, আগে নিজের বাড়ির খোঁজ নাও। তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও মুসলমান হয়ে গিয়েছে। একথা শুনে হযরত উমর তৎক্ষণাৎ নিজের গন্তব্য বদল করে তার বোনের বাড়ি-অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন বাড়ির কাছে পৌঁছেন, ভেতর থেকে কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের শব্দ ভেসে আসছিল; খাব্বাব বিন আরত খুব সুললিত কণ্ঠে তা পাঠ করছিলেন। এই শব্দ শুনে হযরত উমরের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পায়। দ্রুতবেগে হঠাৎ দরজা খুলে তিনি ঘরে প্রবেশ করেন। যাহোক এ শব্দ পেতেই খাব্বাব চট করে কোন জায়গায় আত্মগোপন করেন, পর্দার পেছনে বা কোন এক স্থানে, যেখানে লুকানোর জায়গা ছিল, আর তার বোন ফাতেমা তড়িৎ কুরআন শরীফের পৃষ্ঠাগুলো কোন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেন। হযরত উমর তখন হযরত ফাতেমা ও হযরত সাঈদকে বলেন, শুনলাম তোমরা নাকি নিজেদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছ? আর একথা বলেই তার ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদকে প্রহার করা আরম্ভ করেন। ফাতেমা নিজের স্বামীকে বাঁচানোর জন্য মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান, কিন্তু হযরত উমরের হামলা এমন ভয়াবহ ছিল যে, তা হযরত ফাতেমার উপরও গিয়ে পড়ে এবং তিনি আহত হন। যাহোক ক্ষতবিক্ষত ফাতেমার সাহস বৃদ্ধি পায়; তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, উমর! হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি, তুমি যা করতে পার কর, কিন্তু আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করব না। যাহোক, বোনের এরূপ সাহসিকতাপূর্ণ ও নির্ভিক উত্তর শুনে হযরত উমর চোখ তুলে তাকালে দেখতে পান যে, তার বোনও রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছেন। তিনি এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন যে, তার চেহারা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এই দৃশ্য হযরত উমর (রা.)-এর প্রকৃতিতে গভীরভাবে রেখাপাত করে আর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি বলেন, তোমরা যা পড়ছিলে সেই বাণী আমাকে দেখাও। এটি শুনে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, না, এগুলো এভাবে দেখানো যাবে না, কেননা তুমি সে পৃষ্ঠাগুলো নষ্ট করে ফেলবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি যে, আমি এমনটি করবো না। এগুলো তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবো। তখন হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, তবুও এগুলো এভাবে দেখানো যাবে না। তুমি প্রথমে গোসল করে আস, তারপর দেখো। তিনি গোসল করে আসলে হযরত ফাতেমা (রা.) পবিত্র কুরআনের সেই পৃষ্ঠাগুলি বের করে তাঁর সামনে রেখে দেন। তিনি হাতে নিয়ে দেখেন, এগুলো সূরা ত্বাহা'র প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত ছিল। হযরত উমর (রা.) খুবই ত্রস্ত হৃদয়ে সে আয়াতগুলি পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকৃতি যেহেতু পবিত্র ছিল, তদুপরি মহানবী (সা.)-এর দোয়াও ছিল, তাই তিনি যখন আয়াতগুলো পড়া আরম্ভ করেন তখন ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ তাঁর হৃদয়ে গেঁথে যেতে থাকে। পড়ার এক পর্যায়ে যখন তিনি নিম্নলিখিত আয়াতদ্বয়ে পৌঁছেন যে,

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ
إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعَىٰ

(সূরা ত্বাহা: ১৫-১৬)

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি-ই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও অধিপতি আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। সুতরাং তোমাদের উচিত কেবল আমারই ইবাদত করা এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করা। দেখ, প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অচিরেই আসছে। কিন্তু আমরা সেই সময়কে গোপন রেখেছি যেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়।

এই আয়াত পড়তেই হযরত উমর (রা.) সম্বিৎ ফিরে পান এবং অবলীলায় বলে উঠেন, কী বিস্ময়কর বাণী আর কতই না পবিত্র বাণী! হযরত খাব্বাব (রা.) লুকিয়ে ছিলেন, এ কথা শুনে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বলেন, তোমার মাঝে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তা মহানবী (সা.)-এর দোয়ারই ফসল, কেননা খোদার কসম! গতকালই আমি তাঁকে (সা.) এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি উমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশাম অর্থাৎ আবু জাহল-এর মধ্য থেকে যে কোন একজন ইসলামকে দান কর। যাহোক, হযরত উমর (রা.) এটি শুনে হযরত খাব্বাব (রা.)-কে বলেন, আমাকে বল মহানবী (সা.) কোথায় আছেন? তখনও তরবারি পূর্বের ন্যায় খাপের বাইরে তার হাতেই ছিল। মহানবী (সা.) তখন দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন। যাহোক, খাব্বাব তাকে সেখানকার ঠিকানা বলে দেন। হযরত উমর সেখানে গিয়ে দরজায় সজোরে কড়া নাড়েন। সাহাবীরা দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখেন, হযরত উমর নগ্ন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এটি দেখে তারা দরজা খুলতে ইতস্তত করেন। মহানবী (সা.) বলেন, দরজা খুলে দাও। হযরত হামযাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেন, দরজা খুলে দাও। সে যদি সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো কথা, কিন্তু যদি দুরভিসন্ধি থাকে তবে তার তরবারি দিয়েই তার শিরোচ্ছেদ

করব। দরজা খোলা হয়। হযরত উমর নগ্ন তরবারি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.) নিজের জামার কিনারা টেনে জিজ্ঞেস করেন, হে উমর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি মুসলমান হতে এসেছি। মহানবী (সা.) একথা শুনে আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। বর্ণিত আছে যে, তখন সাহাবীরাও এত জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন যে, মক্কার পাহাড়গুলোতেও সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়।

অতএব, ইনি ছিলেন হযরত সাঈদ যিনি হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) প্রাথমিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মদিনা পৌঁছে তিনি হযরত আবু লুবাবার ভাই হযরত রিফা বিন আব্দুল মুনযেরের ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত রা'ফে বিন মালেকের সাথে তার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করে দেন, তবে অপর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উবাই বিন কা'বের সাথে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) (বদরের) যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাকে অংশীদার করেছেন। এজন্য যেসব সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বা মহানবী (সা.) কোন না কোনভাবে যাদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ দিয়ে বদরে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আমিও তাদেরকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ'র স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি এখানেও বর্ণনা করা জরুরী, তাই বর্ণনা করছি।

এমনিতেও এটি বর্ণনা করার প্রায় দু'তিন মাস কেটে গেছে আর এখানেও বর্ণনা করা প্রয়োজন তাই করছি। যাহোক হযরত সাঈদ বিন যায়েদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো- কুরাইশদের একটি কাফেলার সিরিয়া থেকে রওনা হওয়ার বিষয়ে ধারণা করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে তাঁর যাত্রার দশদিন পূর্বে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে কাফেলার সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। তারা আওরা নামক স্থানে পৌঁছেন। কাফেলা সেই পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেন। আওরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি যাত্রাবিরতি স্থান, হিজায ও সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কাফেলাগুলো এ পথ দিয়েই যাতায়াত করত। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং হযরত সাঈদ এর ফিরে আসার পূর্বেই এ সংবাদ পেয়ে যান যে, কাফেলাটি সেখান থেকে চলে গেছে। তাদের এদিকে আসার কোন ইচ্ছা নেই। তিনি (সা.) সাহাবীদের ডাকেন এবং কুরাইশ কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সঠিক সংবাদ জানা ছিল না, কিন্তু এ কথা জানা যায় যে, এদিকে আসার পরিবর্তে কাফেলা উপকূলীয় পথ ধরে দ্রুত সটকে পড়েছে। সন্ধানীদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তারা দিন রাত সফর অব্যহত রাখে আর যে পথে তাদের আসার সম্ভাবনা ছিল সে পথে আসে নি, ফলে উভয় কাফেলা মুখোমুখি হয় নি। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ ও হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই কাফেলার সংবাদ দেওয়ার জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তারা জানতেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে যাত্রা করেছেন। তারা দু'জন মদিনাতে সেদিন এসে পৌঁছেন যেদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হয়েছেন। তাদের উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হবার জন্য মদিনা থেকে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর বদর থেকে ফিরতি পথে তুরবান নামক স্থানে তাঁর সাথে মিলিত হন। তুরবান মদিনা থেকে আনুমানিক ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে অনেক বেশি পরিমাণে মিষ্টি পানির কূপ রয়েছে। বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যে বাণিজ্য কাফেলা চলে গিয়েছিল আর বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত যে বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছিল, এটি ভিন্ন কাফেলা ছিল। যাহোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনা থেকে এই কাফেলার উদ্দেশ্য বুঝার জন্য বের হয়েছিলেন। জানা ছিল না যে, একটি সেনাবাহিনীও আসছে। যাহোক ঘটনার পরবর্তী অংশ হলো, হযরত তালহা ও হযরত সাঈদ সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদেরকে অংশীদার করেছিলেন আর এই দু'জনকেও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ 'আশারায়ে মুবাশ্‌শেরা' অর্থাৎ, সেই দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখে এ পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান বিন অউফ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদ এবং আবু উবায়দা বিন জারাহ্‌দের প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলেছেন যে, এরা জান্নাতী।

সাঈদ বিন যায়েদ বর্ণনা করেন, আমি নয়জন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতী, আর দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও আমি যদি এই সাক্ষ্য দেই, আমি গুনাহগার হব না। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে? তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে হেরা পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম, তখন সেটি প্রকম্পিত হতে থাকে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে হেরা! স্থির থাক। নিশ্চয়ই তোমার বুকে একজন নবী বা সিদ্দীক অথবা শহীদ অবস্থান করছেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, সেই দশজন জান্নাতী ব্যক্তি কারা? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.), আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ। এরপর প্রশ্ন করা হলো, দশম ব্যক্তি কে? তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, সেই ব্যক্তি আমি। হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে থাকতেন অর্থাৎ তাঁর (সা.) সুরক্ষা করতেন এবং নামাযে তাঁর (সা.) পেছনে দাঁড়াতেন।

হাকীম বিন মুহাম্মদ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত সাঈদ বিন যায়েদের আংটিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ দেখেছেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার অভিযানে যখন রীতিমত সেনা অভিযান চালানো হয় তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ হযরত আবু উবায়দার অধীনে পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। দামেস্ক অবরোধ এবং ইয়ারমুকের চূড়ান্ত যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং জীবন বাজি রেখে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে দামেস্কের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি হযরত আবু উবায়দাকে লিখেন যে, আপনারা জিহাদ করবেন আর আমি এ থেকে বঞ্চিত থাকব– আমি এমনটি করতে পারি না। তাই চিঠি পাওয়া মাত্রই আমার জায়গায় অন্য কাউকে নিযুক্ত করুন যেন যথাশীঘ্র আমি আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারি। হযরত আবু উবায়দা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের সম্মুখে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, অনেক গৃহযুদ্ধ হয়েছে। তিনি তার জগতের প্রতি অনিহা ও তাকওয়ার কারণে এসব ঝগড়া-বিবাদ সর্বদা এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যার সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করতেন তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর তিনি প্রায় সময়ই কুফার মসজিদে বলতেন যে, তোমরা উসমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ এর ফলে যদি উহুদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একইভাবে একদিন কুফার জামে মসজিদে মুগীরা বিন শো'বা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে মন্দ কথা বললে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ বলেন, হে মুগীরা বিন শো'বা! হে মুগীরা বিন শো'বা! হে মুগীরা বিন শো'বা! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এরা দশজন জান্নাতে থাকবে আর তাদের একজন হলেন হযরত আলী। হযরত সাঈদ বিন যায়েদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হতো। একবার কেউ তার বিরুদ্ধে জমি জবরদখল করার অভিযোগ আনে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত সাঈদ বিন যায়েদের জমির সাথে যে জমিটি ছিল তা ছিল আরওয়া বিনতে ওয়ায়েস নামের এক মহিলার। সে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদিনায় নিযুক্ত গভর্ণর মারওয়ান বিন হাকামের নিকট অভিযোগ করে যে, সাঈদ অন্যায়ভাবে আমার জমি দখল করে নিয়েছে। মারওয়ান তদন্ত করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করেন তখন হযরত সাঈদ তাকে জবাব দেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত পরিমাণ ভূমি জবরদখল করবে কেয়ামতের দিন সেই জমির সাতটি স্তর তার গলার বেড়ি হয়ে যাবে- তোমার কী ধারণা, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে একথা শোনার পরও আমি অন্যায় করতে পারি? এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আরওয়া যদি মিথ্যা বলে থাকে তাহলে তাকে সেই সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ তার দৃষ্টিশক্তি চলে না যায় এবং তার ঘরের কূপ তার কবর না হয়। সুতরাং লেখা আছে যে, আরওয়া প্রথমে তার দৃষ্টিশক্তি হারায় এরপর একদিন হাঁটতে গিয়ে নিজের ঘরের কূপে পড়ে মারা যায়। এরপর এটি একটি প্রবাদ হয়ে যায় আর মদিনাবাসী বলতে আরম্ভ করে যে, 'আ'মাকাল্লাহু কামা আমা আরওয়া'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সেভাবে অন্ধ করুন যেভাবে আরওয়াকে অন্ধ করেছিলেন। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ পঞ্চাশ বা একান্ন হিজরী সনে প্রায় ৭০ বছর বয়সে জুমুআর দিন মৃত্যুবরণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী মৃত্যুর সময় তার বয়স ৭০ বছরের বেশি ছিল। মদিনার পার্শ্ববর্তী আকীক নামক জায়গায় তার স্থায়ী নিবাস ছিল। আরব উপদ্বীপে আকীক নামের অনেক উপত্যকা ছিল। সেগুলোর মাঝে মদিনার আকীক উপত্যকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আর এতে মদিনা মুনাওয়ারার সকল উপত্যকা এসে মিলিত হয়। যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর জুমুআর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরত সাঈদ এর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি জুমুআতে না

গিয়ে তখনই আকীকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস গোসল করান আর তার মৃতদেহ লোকেরা কাঁধে করে মদিনায় নিয়ে আসে। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর জানাযার নামাজ পড়ান আর মদিনায় তাকে সমাহিত করা হয়। অপর এক রেওয়াতে অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর যখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদের মৃতুসংবাদ শুনেন, তখন তিনি জুমুআতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি জুমুআতে যান নি বরং তার বাড়ি গিয়ে তাকে গোসল করান, সুগন্ধি লাগান, অতঃপর তার জানাযার নামায পড়ান। কিন্তু আয়েশা বিনতে সা'দ বর্ননা করেন যে, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস গোসল করান, সুগন্ধি লাগান, এরপর ঘরে এসে নিজেও গোসল করেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি বলেন, হযরত সাঈদ বিন যায়েদকে গোসল করানোর কারণে আমি গোসল করি নি বরং গরমের কারণে আমি গোসল করেছি। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এ দু'জনই কবরে নামেন অর্থাৎ লাশ কবরে নামানোর জন্য নামেন।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে দশটি বিয়ে করেছিলেন আর সেই স্ত্রীদের ঘরে ১৩জন পুত্র এবং ১৯জন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলে দিচ্ছি। অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর নাম ছিল আবদে আমর। অপর একটি বর্ণনা মতে তার নাম ছিল আব্দুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (সা.) তার এই নাম পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখে দেন। তিনি বনু যোহরা বিন কিলাব গোত্রের সদস্য ছিলেন। সাহলা বিনতে আসেম বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ফর্সা, সুন্দর চোখ, লম্বা পলক ও খাঁড়া নাকের অধিকারী ছিলেন। তার ওপরের দিকের ছেদন দাঁত ছিল লম্বা এবং কানের লতি পর্যন্ত চুল ছিল। এছাড়া তিনি দীর্ঘ গ্রীবা, দৃঢ় হাতের তালু ও মোটা আঙ্গুলের অধিকারী ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম বিন সাঈদ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) দীর্ঘকায়, ফর্সা বর্ণ যাতে লালাভ মিশ্রণ ছিল, সুদর্শন এবং কোমল ত্বকের অধিকারী ছিলেন আর তিনি খিজাব লাগাতেন না। তার সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কিছুটা খঞ্জ ছিলেন আর এটি হয়েছে উহুদের যুদ্ধের পর। কেননা উহুদের যুদ্ধে তিনি আল্লাহ্ তা'লার পথে আহত হয়েছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সেই দশজন সাহাবীর একজন ছিলেন যারা তাদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তিনি শুরার সেই ছয় সদস্যের একজন ছিলেন যাদেরকে হযরত উমর (রা.) খিলাফতের নির্বাচনের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। সেই ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় এদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আমুল ফীল অর্থাৎ হস্তিবাহিনী সংক্রান্ত ঘটনার ১০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (রা.) সেই গুটিকতক ব্যক্তির একজন ছিলেন যারা অজ্ঞতার যুগেও মদ পান করাকে নিজেদের জন্য হারাম জ্ঞান করতেন। তিনি (রা.) ইসলামের প্রথম ৮ জন মুসলমানের একজন ছিলেন। মহানবী (সা.) দ্বারে আরকামকে প্রচারকেন্দ্র হিসেবে অবলম্বনের পূর্বেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতেই অংগ্রহণ করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত হলো, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমাদের মদিনায় আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এবং হযরত সা'দ বিন রবি (রা.)-কে পরস্পর ভাই-ভাই বানিয়ে দেন। তখন সা'দ বিন রবি (রা.) বলেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক সম্পদশালী, কাজেই আমি (আমার সম্পদ) ভাগ করে অর্ধেকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, আর আমার দুইজন স্ত্রীর মধ্যে থেকে যাকে আপনার পছন্দ হয় তাকে আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিব। তার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আপনি তাকে বিয়ে করুন। একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আপনার ধন ও জনসম্পদে বরকত দিন, আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু বলুন, এখানে কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসাবাণিজ্য হয়? হযরত সা'দ (রা.) বলেন, কায়নুকার বাজার রয়েছে। এটি জানার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) প্রভাতে সেখানে যান এবং ব্যবসা করেন। সেখান থেকে লভ্যাংশ হিসেবে পনির ও ঘি নিয়ে আসেন আর তা নিয়ে হযরত সাদের বাড়িতে আসেন। এভাবে তিনি প্রতিদিন সকালে সেই বাজারে যান, ব্যবসা করেন এবং আয়-উপার্জন করতে থাকেন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) আসেন এবং তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? তিনি বলেন, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কাকে? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, এক আনসারী মহিলাকে। তখন তিনি (সা.) জানতে চান, দেনমোহর কত দিয়েছ? তিনি (রা.) বলেন, একটি খেজুর-আঁটি সমপরিমাণ স্বর্ণ অথবা স্বর্ণের একটি আঁটি। একথা

শুনে মহানবী (সা.) বলেন, একটি ছাগল জবাই করে হলেও বউভাত কর। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার এমনও হয়েছে যে, আমি কোন পাথর উঠালেও আশা করতাম, (এর) নিচে সোনা কিংবা রূপা পাওয়া যাবে অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর) ব্যবসায় এতটা বরকত দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বদর এবং উহুদসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি সৈন্য-সারিতে দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় আমি আমার ডানে ও বামে তাকালাম। আমি দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক আনাসারী বালক দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, হায়! আমার উভয় পাশে যদি দু'জন এমন মানুষ থাকত যারা হবে এদের চেয়ে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠদেহী! এ অবস্থায় তাদের একজন আমার হাতে চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, চাচা! আপনি কি আবু জাহলকে চিনেন? আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু ভাতিজা! তার সাথে তোমার কী কাজ? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, সে মহানবী (সা.)-কে গালমন্দ করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি তাকে একবার দেখতে পাই তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত আমার চোখ তার চোখ থেকে সরবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত হই। এরপর অপরজনও আমার হাতে চাপ দিয়ে একই কথা জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবু জাহলকে আমি তার লোকদের মাঝে প্রদক্ষিণ করতে দেখলাম। আমি বললাম, তোমরা আমাকে যার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে ঐ দেখ সেই ব্যক্তি। একথা শোনামাত্রই তারা দু'জন বিদ্যুৎ গতিতে নিজেদের তরবারি নিয়ে তার দিকে ছুটে যায় আর তাকে এতটা আঘত করে যে, প্রাণেই মেরে ফেলে। এরপর তারা ফিরে এসে মহানবী (সা.)-কে অবহিত করে। তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উত্তরে তারা উভয়েই বলে, আমি তাকে হত্যা করেছি। পরে তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছ? তারা বলল, না। তিনি (সা.) তরবারি দু'টি দেখে বলেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ এবং তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুআয বিন আমর বিন জমূহ্ পাবে। আর তাদের উভয়েরই নাম মুআয ছিল অর্থাৎ, মুআয বিন আফরা (রা.) এবং মুআয বিন আমর বিন জমূহ্ (রা.)। এটি সহীহ বুখারীর হাদীস।

আবু জাহলের হত্যা সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা পূর্বেও করা হয়েছে, পুনরায় বলে দিচ্ছি। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, আফরার দুই ছেলে মুয়াওয়েয এবং মুআয আবু জাহলকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিল, এরপর তার মুণ্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)। ইমাম ইবনে হাজ্‌র আসকালানী এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন যে, মুআয বিন আমর (রা.) এবং মুআয বিন আফরা (রা.)-এর পর হয়তো মুয়াওয়েয বিন আফরা (রা.)ও তাকে আঘাত করে থাকবেন। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা ফতহুল বারীতেও এটি লেখা আছে।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার জননেতা ও কাফের সেনাদলের সেনাপতি আবু জাহল যখন বদরের যুদ্ধে সেনাদলকে বিন্যস্ত করছিল, এমন সময় আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর মতো অভিজ্ঞ জেনারেল বলেন, আমি আমার ডানে ও বামে ১৫ বছর বয়সী দু'জন আনসারী বালককে দেখতে পাই। তাদেরকে দেখে আমি ভাবলাম, আজ হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ নেই, কেননা দুর্ভাগ্যবশত আমার চতুর্দিকে অনভিজ্ঞ বালকরা দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আবার আনসারী বালক, যুদ্ধ সম্পর্কে যাদের কোন সংস্রবই নেই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেন, হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, আমি এই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম এমন সময় আমার শরীরের ডান পাশে (কারো) কনুই লাগে, আমার মনে হলো, ডান দিকের বালকটি কিছু বলতে চায়। আমি তার দিকে মুখ ফেরাতেই সে বলে, চাচা! একটু ঝুঁকে কথা শুনুন। আমি আপনার কানে কানে একটি কথা বলতে চাই যেন আমার সাথী শুনতে না পায়। তিনি বলেন, আমি তার দিকে কান বাড়িয়ে দিলে সে বলে, চাচা! আবু জাহল কে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এত বেশি কষ্ট দিত? চাচা! আমার মন চায় আমি তাকে হত্যা করি। তিনি (রা.) বলেন, তার কথা শেষ হতে না হতেই আমার বাম দিকে (কারো) কনুই লাগে। তখন আমি আমার বাম দিকের বালকের দিকে ঝুঁকি আর বাম দিকের সেই বালকও একই কথা বলে যে, চাচা! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যে এত কষ্ট দিত সেই আবু জাহল কে? আমার মন চায় আমি আজ তাকে হত্যা করি। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বলেন, অভিজ্ঞ যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আবু জাহল, যে ছিল সেনাপতি, অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এবং সেনাপরিবেষ্টিত, তাকে আমি হত্যা করতে পারব। আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করে একইসাথে উভয় বালককে বললাম, সামনে যে ব্যক্তি শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় লৌহবর্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধারা নগ্ন তরবারি হাতে প্রহরা দিচ্ছে, সে হলো আবু জাহল। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল

তাদেরকে এটি বুঝিয়ে দেয়া যে, এ কাজ তোমাদের মতো অনভিজ্ঞ বালকদের জন্য সাধ্যাতীত। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, কিন্তু যে আঙুল দিয়ে আমি ইশারা করেছিলাম তা নামিয়ে আনার পূর্বেই সেই আনসারী বালকদ্বয় চড়ুই পাখির ওপর বাজ পাখির আক্রমণ করার ন্যায় কাফিরসারিগুলোকে বিদীর্ণ করে আবু জাহলের দিকে ছুটে। আবু জাহলের সম্মুখে তার পুত্র ইকরামা দাঁড়িয়ে ছিল। সে অনেক সাহসী এবং অভিজ্ঞ জেনারেল ছিল। কিন্তু এই আনসার বালকেরা এত দ্রুতগতিতে দৌঁড়ে যায় যে, কেউ তাদের অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারে নি। চোখের পলকে তারা আবু জাহলের ওপর আক্রমণ করার জন্য কাফেরদের সারিগুলোকে বিদীর্ণ করে একেবারে দেহরক্ষীদের কাছে পৌঁছে যায়। নগ্ন তরবারি হাতে যেসব দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সময়মতো নিজেদের তরবারিও নামিয়ে আনতে পারে নি। শুধুমাত্র একজন প্রহরীর তরবারি নিচে আসতে সক্ষম হয় যার ফলে একজন আনসার বালকের বাহু কেটে যায়। কিন্তু যাদের কাছে জীবন বলি দেয়া সহজ মনে হচ্ছিল তাদের জন্য বাহু কেটে যাওয়া কীইবা বাদ সাধতে পারত! যেভাবে পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পতিত হয় ঠিক একইভাবে সেই বালকদ্বয় দেহরক্ষীদের ওপর বল প্রয়োগ করে আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই কাফের-সেনাপতিকে ভূপাতিত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের শেষের দিকে আমি সেখানে পৌঁছাই যেখানে আবু জাহল মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। আমি বললাম, কী অবস্থা তোমার? সে বলল, আমি মারা যাচ্ছি, কিন্তু আক্ষেপ নিয়ে মারা যাচ্ছি। মারা যাওয়া কোন বড় বিষয় নয় কিন্তু আক্ষেপ হলো, হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আনসারদের দুই বালক আমাকে ভূপাতিত করেছে। মক্কাবাসীরা আনসারদের অনেক তুচ্ছ মনে করত। তাই অনেক আক্ষেপের সাথে সে এর উল্লেখ করে আর বলে, এই আক্ষেপ হৃদয়ে নিয়ে মারা যাচ্ছি যে, আনসারদের দু'জন ছোকরা আমাকে হত্যা করেছে। এরপর সে তাঁকে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)-কে বলে, আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। তুমি কি আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু করবে? অর্থাৎ তরবারির এক আঘাতে আমার জীবনাবসান ঘটাবে। কিন্তু আমার ঘাড়টা একটু লম্বা করে কাটবে, কেননা সেনাপতির চিহ্ন হলো তার ঘাড় লম্বা করে কাটা হয়। আমাকে হত্যা কর আর এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও মর্মে আবু জাহলের অনুরোধ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ মেনে নেন, কিন্তু তিনি চিবুকের কাছ থেকে তার গলা কাটেন। অর্থাৎ মৃত্যুলগ্নে তার এই বাসনাও পূর্ণ হয় নি যে, তার ঘাড় যেন লম্বা করে কাটা হয়।

শিশুদের মাঝেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি কেমন প্রেম ও ভালোবাসা ছিল আর কীভাবে তারা তাঁর (সা.) শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইত– (তাদের) কুরবানী প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

এই ঘটনাটি পূর্বেও দু'একবার বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের সবার এ ছিল কুরবানী ও এ ছিল ভালোবাসা আর এ ছিল প্রেম– যার কারণে নিজ প্রাণের কোন মায়া তাদের ছিল না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে করব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সংঘাতময় বিশ্বে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা

যুক্তরাজ্যের ১৪শ জাতীয় পীস সিম্পোজিয়ামে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বজনীন ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত মূল ভাষণ

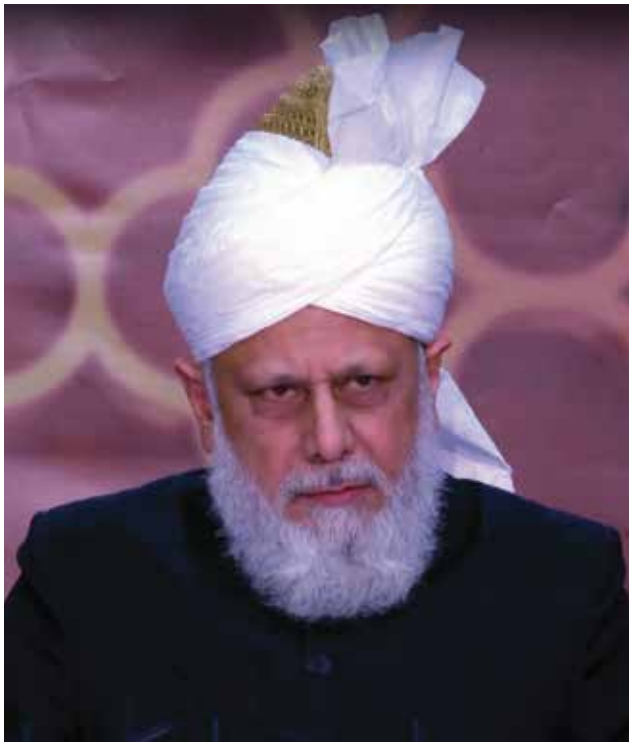

২৫ মার্চ ২০১৭ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বজনীন ইমাম, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত ১৪শ জাতীয় পীস কনফারেন্সে মূল বক্তব্য রাখেন। লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথি সমেত ৩০টি দেশের ৬০০ অ-আহমদী মেহমানসহ ১০০০ এর অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত হুযূর নিউক্লীয় অস্ত্র অপসারণের আন্দোলনে অসামান্য অবদানের জন্য হিরোশিমা বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া শান্তি কর্মী সেতসুকো থারলো-কে শান্তির প্রসারের জন্য আহমদীয়া মুসলিম পুরস্কারে ভূষিত করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক হায়াত এর স্বাগত বক্তব্য ও ইতালীর রিলিজিয়ন্স ফর পীস-এর নির্বাহী পরিচালক সিলভিও দানিও-এর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের পর, সাউথওয়ার্ক এর আর্চবিশপের প্রতিনিধিত্বকারী ফাদার ডেভিড স্ট্যানলী পীস সিম্পোজিয়ামের সমর্থনে ভ্যাটিকান থেকে প্রেরিত একটি বাণী পাঠ করে শোনান। এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত হুযূর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত মূল ভাষণের বঙ্গানুবাদ নিম্নে পেশ করা হল।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সম্মানিত অতিথিবর্গ, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু -- আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

প্রথমত আমি ওয়েস্টমিন্‌স্টারে বুধবারের সন্ত্রাসী হামলায় হতাহতদের সকলের প্রতি আমার গভীরতম শোক ও সমবেদনা জানাতে চাই। এ সংকটময় মুহূর্তে আমাদের চিন্তা ও দোয়া লন্ডনবাসীদের সাথে রয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে আমি এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করতে চাই যে, এ ধরনের সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে আমরা নিন্দা জানাই এবং এ বর্বর নৃশংসতার সকল হতাহতের প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়-নিংড়ানো সহানুভূতি পেশ করি। বিশ্বের সকল প্রান্তে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শান্তির প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে, আর ইসলামের শিক্ষার অনুসরণে এ সকল নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সরব হয়। এই বার্ষিক পীস সিম্পোজিয়াম (শান্তি সম্মেলন)-টিও এ প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি আমাদের সকল অতিথিকে আজ এ সন্ধ্যায় আমাদের সাথে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেন যে, এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে তাঁকে খোদা তা'লা পাঠিয়েছেন যেন ইসলামী শিক্ষার দুই প্রধান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। প্রথমটি হল মানবতাকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করা আর দ্বিতীয়টি হল একে অপরের অধিকার আদায়ের প্রতি মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটি আমার বিশ্বাস যে এ দু'টি উদ্দেশ্যের পূর্ণতা হল সেই ভিত্তি

প্রস্তর যা বিশ্বে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বশর্ত।

মুসলিম হিসেবে আমরা সৌভাগ্যবান যে পবিত্র কুরআন আমাদেরকে অবহিত করেছে যে আমাদের সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, সম্ভব হলে মসজিদে সমবেত হয়ে। অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, এ সকল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণ পরিপন্থিভাবে, কতক মুসলিম গ্রুপ বা ব্যক্তি তাদের মসজিদ ও মাদরাসাগুলোকে জঙ্গীবাদের কেন্দ্রে পরিণত করেছে, যেখানে তারা ঘৃণার প্রসার করে চলেছে আর তারা অপরকে অ-মুসলিম ও ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করতে প্ররোচিত করছে। স্বভাবতই, এটি পশ্চিমা জগতে ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার করেছে আর এ ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, মসজিদসমূহ সংঘাত ও বিশৃংখলার উৎস।

এর ফলস্বরূপ পশ্চিমা জগতে কতক দল ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এ দাবি উঠেছে যে, মসজিদসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক, অথবা অন্তত, মুসলমানদের উপর কিছু বাঁধা-নিষেধ আরোপ করা হোক। উদাহরণস্বরূপ হিজাব নিষিদ্ধ করার জন্য দাবি রয়েছে বা মিনার ও অন্যান্য ইসলামী প্রতীকের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দুঃখজনকভাবে, কতিপয় মুসলিম অন্যদেরকে ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। একজন মুসলমানের জন্য কেবল নামায পড়া আবশ্যক নয়, বরং তার জন্য এতীমদের দেখাশোনা করা ও দরিদ্রদের আহার করানোও আবশ্যক, নতুবা আমাদের নামায বৃথা যাবে। পবিত্র কুরআনে সূরা আল মা'উনের তিন, চার ও পাঁচ নম্বর আয়াতে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে।

এ শিক্ষাগুলোর ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বঞ্চিত মানুষের দুর্বিসহ যাতনা ও দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে নানা মানবসেবামূলক প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। আমরা হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছি যেগুলো বিশ্বের কতক সর্বাধিক দারিদ্র্যকবলিত ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা প্রদান করে আসছে।

আমরা এ সকল কাজের জন্য কোন প্রশংসার প্রত্যাশী নই, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ সকল মানুষকে তাদের নিজের দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে সাহায্য করা, যেন তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে আর এর ফলস্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে জীবনযাপন করতে পারে। এভাবে বিক্ষুব্ধ বোধ করে চরমপন্থিতার দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকিতে থাকার পরিবর্তে তারা তাদের দেশের দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। যেখানে তারা ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি করবে, সেখানে তারা তাদের জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে আর অন্যদেরকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে।

অনুরূপভাবে, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিমূলে এ বিষয়টি রয়েছে যে, মুসলমানদের অবশ্যই সমাজের অন্য সকলের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে হবে এবং কখনো তাদের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হওয়া যাবে না। এ সত্ত্বেও অনেকেই ইসলামকে সহিংসতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে, যদিও কোন কিছু সত্য থেকে এর চেয়ে বেশি দূরে

হতে পারে না। সন্ত্রাসীরা যা-ই দাবি করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই নিরীহ ব্যক্তিকে আক্রমণ বা হত্যা করাকে কখনোই বৈধতা দেয়া হয় নি। মানব জীবনের অলংঘনীয়তাকে ইসলাম যেন খোদাই করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে:

"যে কেউ এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো... সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হত্যা করলো, আর যে কেউ এক ব্যক্তিকে বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে বাঁচালো।"

এটি কতই না স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এক বিবৃতি। কখনো কখনো কেউ কেউ প্রশ্ন করেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে কেন যুদ্ধসমূহ হয়েছে? অনুরূপভাবে, তারা প্রশ্ন করেন ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা কেন পরিচালিত হচ্ছে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি সব সময় পবিত্র কুরআনের সূরা আল হাজ্জের দু'টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি, যেখানে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের প্রথম আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সূরা আল হাজ্জের ৪০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে - আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

এর পরবর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনে সেই কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে যার জন্য মহানবী (সা.)-কে যুদ্ধে রত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। সূরা আল হাজ্জের ৪১ আয়াতে বলা হয়েছে:

"যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি হতে শুধুমাত্র এ কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' - আর যদি আল্লাহ্ এদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ, যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করানো হয়, ধ্বংস করে দেয়া হত। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী।"

এ আয়াতগুলো কি প্রমাণ করে? নিশ্চয়ই এতে মুসলমানদেরকে অন্যের উপর নিষ্ঠুর আচরণের বা অন্যের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার অনুমতি প্রদান করা হয় নি। বরং এগুলো সকল মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব স্থাপন করে যেন তারা অন্যান্য ধর্মের সুরক্ষা করে ও কোন প্রকার জবরদস্তি বা চাপ থেকে মুক্ত হয়ে সকল মানুষের স্বাধীনভাবে নিজ বিশ্বাসের অধিকার নিশ্চিত করে।

সুতরাং, ইসলাম হল সেই ধর্ম যা ধর্মের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতিসমূহকে চিরন্তনভাবে ধারণ করে রেখেছে।

অতএব, আজ যদি কিছু তথাকথিত মুসলিম গোষ্ঠী বা দল থেকে থাকে যারা নরহত্যা করে চলেছে, তবে একে কেবল সবচেয়ে কঠিনতম ভাষায় ধিক্কার

জানানোই সম্ভব। তাদের বর্বর কর্মকাণ্ড ইসলাম যা কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এটি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে এসব লোকেরা যে ধর্মবিশ্বাস অনুসরণের দাবি করে তা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

উদাহরণস্বরূপ, ব্রাসেল্‌স ও প্যারিস আক্রমণে সম্পৃক্ত একজন সন্ত্রাসীর আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মি. স্‌ভেন মেরী সম্প্রতি একটি ফরাসী সংবাদপত্রে একটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। নিশ্চিতভাবেই যখন তাকে (সেই সন্ত্রাসীকে) প্রশ্ন করা হয় তিনি কোন দিন কুরআন পড়েছেন কিনা, তার মক্কেলের সহজ স্বীকারোক্তি ছিল যে, তিনি কোন দিনই কুরআন পড়েন নি, কেবল অনলাইন একটি তফসীর পড়েছেন।

তদুপরি মার্চ ২০১৬ তে রয়েল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্‌স প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে এ উপসংহারই টানা হয়, যে সকল সন্ত্রাসী নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের এর শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান সামান্য অথবা শূন্য। যে সকল মুসলিম যুবকদের উগ্রপন্থিতার মন্ত্র পড়ানো হয়েছে এবং যারা পাশ্চাত্য জগতে আক্রমণসমূহ পরিচালনা করেছে তাদের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে:

"তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা যেমন তুলনামূলকভাবে সীমিত, তেমনি ধর্মের দর্শন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃসন্দেহে অগভীর ও ভাসা-ভাসা।... তাদের পূর্বসূরীদের চরমপন্থিতা ও সন্ত্রাসের দিকে যাত্রার গোড়াতে অনেক ক্ষেত্রেই অন্যায়-অবিচারের বিষয় ছিল। বর্তমানে এর স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত জীবনের অস্থিরতা ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসমূহ তাদের এ পথে যাত্রা মূখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।"

উপরন্তু, ওয়াশিংটন পোস্টে উদ্ধৃত এক প্রবন্ধে, বেলজিয়ামের সন্ত্রাস প্রতিরোধকারী সংস্থার এক কর্মকর্তা এ্যালেইন গ্রিগনার্ড বলেন:

"সমাজ থেকে তাদের বিদ্রোহ প্রথমে ছোট ছোট অপরাধ ও দস্যুপনা হিসেবে প্রকাশ পায়। তাদের অনেকেই বস্তুত রাস্তার কোন মাস্তান দলের সদস্য। ইসলামিক স্টেট-এর অভ্যুদয় তাদের সামনে ইসলামের এমন এক ধারাকে একে দেয় যা তাদের উচ্ছৃংখল কর্ম-পদ্ধতিকে বৈধতা দান করে।"

সুতরাং অ-মুসলিম বিশেষজ্ঞগণও স্বীকার করেন যে সন্ত্রাসীরা ইসলামের এক "নতুন ধারা" প্রতিষ্ঠা করেছে, যাকে ইসলামের শিক্ষাসমূহের এক ঘৃণ্য বিকৃতি হিসেবেই কেবল বর্ণনা করা যায়। যারা এ নতুন ধারাকে অবলম্বন করেছে, আর নির্দয়ভাবে নিরীহ মানুষের হত্যা, অঙ্গহানি ও ধর্ষণ করছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তারা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার দায়ে দোষী।

অপরপক্ষে, এটিও স্পষ্ট যে অমুসলিমদের মাঝে এমন কতক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছে যারা এ বিভেদ ও সহিংসতার আগুনে বাতাস দিচ্ছে এবং যারা ইসলামের শিক্ষাকে অন্যায়ভাবে অপদস্থ ও অবমূল্যায়ন করাকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত সপ্তাহেই ফরেন পলিসি শীর্ষক সাময়িকীতে প্রকাশিত এক কলামে সাংবাদিক বেথানি এ্যালেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক আর্থিক মদদপুষ্ট ও অত্যাধুনিক নেটওয়ার্কের কথা লেখেন যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইসলামের ভীতিকে উসকে দেয় এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বিস্তারের সকল প্রচেষ্টাকে রোধ করা। ফরেন পলিসি-র প্রবন্ধের বলা হয়েছে:

"একটি আর্থিক মদদপুষ্ট নেটওয়ার্ক আমেরিকার মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয়ার বিষয়ে সচেষ্ট আছে আর তারা আতঙ্কের রাজনীতিতেই কেবল ইন্ধন যোগাচ্ছে... আমেরিকার চরম ডানপন্থী, মুসলিম বিদ্বেষী চক্র ইসলামের হুবহু সেই বিকৃত ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করেছে, যা ইসলামিক স্টেট (আইসিস) প্রচার করে থাকে।"

লেখক আরো লেখেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় মুসলমানেরা শিকার হচ্ছে:

"... ইসলামভীতির প্রসারকারী এক ক্রমাগত শক্তিবর্ধিষ্ণু চক্রের যা ভারসাম্যপূর্ণ ও উন্মুক্ত সংলাপের সকল সুযোগকে সংকীর্ণ করে, এবং সেই সকল মুসলমানকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলে যারা ইসলামের মূলধারার শান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাসমূহ প্রচারের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

তিনি লেখেন:

"যুক্তরাষ্ট্রে মত প্রকাশ ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা শক্তিশালীভাবে সংরক্ষিত ... কিন্তু, একটি পরিকল্পিত নেটওয়ার্ক এখন মুসলিমদের সেই অধিকার হরণের এবং ইসলামকে একটি ধর্মের পরিবর্তে একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টায় রত -- আর এর সাথে দ্বিমত পোষণকারী যেকোন মুসলমানের মুখ বন্ধ করে দিতে ও তাদের অবমূল্যায়িত করতে তারা তৎপর।"

এ প্রবন্ধটিতে যুক্তরাষ্ট্রে এক শান্তিপ্রিয় মুসলমানের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাতে তুলে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা প্রদানের পর পরই, একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী তার পিছনে লেগে যায় এবং তাকে খুন, দাসপ্রথা ও ধর্ষণের পক্ষের মানুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। তার পরিবারকে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়। তার তৎক্ষণাৎ পদচ্যুতি দাবি করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করতেন সেটিকে ইমেইলে প্লাবিত করে দেয়া হয়। অতএব, এমন ঘটনাবলী প্রমাণ

করে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করার এবং এর প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে না দেয়া একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা চলমান আছে।

তার নিজ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লেখক এ উপসংহারে উপনীত হন যে:

"এ প্রক্রিয়ায়, তারা ইসলামকে সেই ব্যবহারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে যা খ্রিস্টধর্ম উপভোগ করছে, আর তারা ঠিক সেই মানুষগুলোর বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে যারা আধুনিক আমেরিকান জীবনধারার সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধনের জন্য সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছেন। আর সেটিই তো আসল উদ্দেশ্য হতে পারে।"

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা প্রায়ই রাজনীতিবিদদের ও নেতৃবর্গের মুখে অযথা উত্তেজনাকর বিবৃতিসমূহ শুনে থাকি যেগুলো সত্যের সাথে নয়, বরং তাদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান নতুন মার্কিন প্রশাসনের এক মন্ত্রীসভা সদস্য ড. বেন কারসন গত বছর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী থাকাকালীন এক বক্তৃতায় ইসলামকে একটি ধর্ম বলে অভিহিত না করে একটি "জীবন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি" হিসেবে উল্লেখ করেন।

উপরন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর সম্পর্কে ড. কারসন বলেন:

"আমার পরামর্শ এই যে, সকলেরই উচিত কয়েকটি ঘন্টা ব্যয় করে ইসলাম সম্পর্কে একটু পড়াশোনা করে নেয়া। পড়ুন মুহাম্মদ সম্পর্কে। পড়ুন কিভাবে মক্কায় তার জীবনের সূচনা। পড়ুন মক্কার লোকেরা তাকে কি চোখে দেখতো– খুব একটা মূল্য দিতো না... কিভাবে তার চাচা প্রভাবশালী ছিলেন এবং তাকে রক্ষা করতেন। যখন তার চাচার মৃত্যু হল, তাকে পালাতে হল। তিনি উত্তরে মদীনায় গেলেন ... সেখানেই তিনি তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করলেন, আর এমন সকলকে হত্যা করতে শুরু করলেন যারা সেই বিশ্বাসের অনুসারী ছিল না যা তাদের বিশ্বাস ছিল।"

আমি ড. কারসনের সঙ্গে একমত, কেবল এ পর্যন্ত যে, আমিও এ পরামর্শ দিব যে, মানুষ যেন ইসলামের মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা করতে সময় ব্যয় করেন। যদি তারা নিরপেক্ষ বর্ণনাগুলো অনুসরণ করেন, তারা নিজেরাই দেখতে পারবেন যে, মহানবী (সা.) কোন দিনই অমুসলিমদের কোন "হত্যাযজ্ঞ"-তে জড়িত ছিলেন না আর এমন দাবিসমূহ ইতিহাসের ধৃষ্টতাপূর্ণ অস্বীকৃতি মাত্র। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, বহু বছরের বিরামহীন ও কঠোর নিপীড়নের ফলস্বরূপ, তিনি ও তাঁর অনুসারীরাই তাঁর মাতৃভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যেখানে তারা স্থানীয় ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন। কিন্তু মক্কার অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের শান্তিতে বাস করতে না দিয়ে, আক্রমণাত্মকভাবে মদীনা পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ইসলামকে চিরতরে নির্মূল করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই ছিল ইসলামের ইতিহাসের সেই ক্রান্তি লগ্ন যখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। এ অনুমতি এ জন্য দেয়া হয়েছিল, যেভাবে পূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলো নিশ্চিত করে, এ উদ্দেশ্যে যে বিশ্বাসের স্বাধীনতার সার্বজনীন নীতি যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং, এ অভিযোগ যে মহানবী (সা.) এক সহিংস নেতা বা যুদ্ধবাজ ব্যক্তি ছিলেন এটি সর্বোচ্চ পর্যায়ের এক অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা আর এরূপ মিথ্যা দাবি কেবল বিশ্ব জুড়ে লক্ষ-কোটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানের হৃদয়কে কেবল ব্যথিতই করতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নিজ সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ইসলামের মহানবী (সা.) সর্বদা শান্তি ও সমঝোতাই কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে আমার মুখের কথা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে এমন নয়; বরং বিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট লেখিকা রুথ ক্র্যানস্টন তাঁর ১৯৪৯ সালের বই ওয়ার্ল্ড ফেইথ (বিশ্ব ধর্ম)-এ কী লিখেছেন তা শুনুন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর চাপিয়ে দেয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের ব্যবহারের তুলনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন:

"মুহাম্মদ কখনো সংঘাত ও রক্তপাতের সূচনা করেন নি। যতগুলো যুদ্ধ তিনি তিনি লড়েছেন সেগুলো ছিল প্রতিক্রিয়ামূলক। টিকে থাকার জন্য আত্মরক্ষামূলক তিনি লড়েছিলেন।... আর তিনি সমসাময়িক অস্ত্র দিয়ে সমকালীন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছিলেন।... নিশ্চিতভাবে ১৪ কোটি মানুষের এমন কোন খ্রিস্টান রাষ্ট্র যেটি একটিমাত্র বোমা দিয়ে ১,২০,০০০ অসহায় বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে, এমন এক নেতার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না যিনি বড় জোর পাঁচ কি ছয়শত মানুষকে হত্যা করেছেন।"

সৌভাগ্যের কথা যে, এমন এক পরিবেশে যেখানে ইসলামকে চরমপন্থিতা ও সন্ত্রাসের এক ধর্ম হিসেবে তিরস্কার করাটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন কতক অমুসলিম সাংবাদিক ও পর্যালোচক রয়েছেন যারা সততা ও ন্যায়ের সাথে লিখে থাকেন। এ জন্য আমি তাদেরকে, মিথ্যা ও অবিচারের সর্ববিস্তারী স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাধুবাদ জানাই। আর আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিও আমি বিশেষ সাধুবাদ ব্যক্ত

করতে চাই যিনি তাঁর কতক বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতিমূলে ইসলামের শিক্ষার উপর উত্থাপিত আপত্তিসমূহের খণ্ডন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আমি ফরেন পলিসি সাময়িকীতে জুলিয়া ইওফে রচিত একটি প্রবন্ধেরও প্রশংসা করতে চাই যেখানে তিনি ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাসের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উপসংহার টেনেছেন এ কথা বলে যে:

"কোন ধর্মই অন্তর্নিহিতভাবে সহিংস নয়। কোন ধর্মই অন্তর্নিহিতভাবে শান্তিপূর্ণ নয়। ধর্ম, তা যে কোন ধর্মই হোক না কেন, ব্যাখ্যা সাপেক্ষ, আর প্রায়শই এই ব্যাখ্যাতেই আমরা সৌন্দর্য্য বা কদর্য দেখতে পাই।"

আমি এ পক্ষপাতহীন উপসংহারকে সাধুবাদ জানাই। আমরা যখন এ অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও সঙ্গীন সময় অতিক্রম করার চেষ্টা করছি, এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একে অপরকে দোষারোপ করে কোন লাভ হবে বরং তা কেবল বিভেদ ও শত্রুতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এর পরিবর্তে, সময়ের দাবি এই যে, আমরা যেন সেই সকল দেয়ালকে ভেঙে ফেলি যেগুলো আমাদেরকে বিভক্ত করে রেখেছে। এমন দেয়াল নির্মাণের পরিবর্তে যা আমাদেরকে একে অপর থেকে দূরে রাখবে, আমাদের উচিত এমন সেতু বন্ধন রচনা করা যা আমাদেরকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, একটি দিনও এমন যায় না যখন নতুন সহিংসতা ও সন্ত্রাসী হামলার সংবাদ আমাদের কাছে আসে না। সন্দেহাতীতভাবে, বিশ্ব মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্রমাগত অধিকতর বিপজ্জনক এক স্থানে পরিণত হচ্ছে। তাই, আমাদের অবশ্যই সকল প্রকার নিপীড়ন ও ঘৃণার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতে হবে, আর আমাদের সর্বশক্তি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে নিয়োজিত করতে হবে। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই শান্তি চাই তবে বিশ্বের রাজনীতিবিদ, নেতৃবর্গ, প্রচারমাধ্যম ও দলগুলোকে অবশ্যই প্রজ্ঞা ও উদারতার সাথে আচরণ করতে হবে।

এমন অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে এ ধারণা পেশ করা হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জগতে তাদের বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ ও বিদ্রূপের কারণে তাদের মধ্যে ক্ষোভের অনুভূতি সঞ্চারিত হওয়ার কারণেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান যুবক চরমপন্থিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কোন ভাবেই এটি তাদেরকে আচরণকে যথার্থতা বা দায়মুক্তি দেয় না আর তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই দোষী ও দণ্ড প্রাপ্য। তথাপি, সাধারণ জ্ঞান আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদেরও জ্বলন্ত আগুনে তেল ঢালা উচিত না। বরং আমাদের উচিত পারস্পরিক সমঝোতার সন্ধান করা, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং তাদের সাথে নিজেদের মিলগুলোর সন্ধানে থাকা।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও মূল্যবান এক মূলনীতি ৩:৬৫ আয়াতে পেশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে:

"তোমরা এমন এমন এক কথায় আস, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে সমান"

এখানে কুরআন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক স্বর্ণালী নীতি পেশ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মানুষের উচিত সে সব বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করা যা তাদেরকে একতাবদ্ধ করে। বড় বড় ধর্মের ক্ষেত্রে একতা আনয়নকারী সত্তা খোদা তা'লা স্বয়ং, কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে একজন ধার্মিক মানুষের সাথে একজন ধর্মহীন মানুষের কোনই মিল নেই। তাই, কুরআন আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে এক শান্তিপূর্ণ, বহুজাতিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সকল ধর্ম ও মতের মানুষ সহাবস্থান করতে পারবে। এর মূল উপাদান হল পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। অনুরূপভাবে আরেক স্থানে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে যে মুসলমানগণের অন্যের প্রতিমা বা উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত না, কেননা প্রতিক্রিয়ায় তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ ভাষায় উল্লেখ করবে আর অন্তহীন ক্ষোভের এক চক্রের সূচনা হয়ে যাবে।

যেমনটি আপনারা অবহিত আছেন, আজকের সন্ধ্যার এ অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু "বৈশ্বিক সংকটসমূহ ও ন্যায়ের আবশ্যকতা"। আর আমি বহু বছর ধরে বলে আসছি যে, আমাদের সমাজের পরতে পরতে ন্যায়ের অভাব ছড়িয়ে পড়েছে এবং এটিই নৈরাজ্যকে ইন্ধন যুগিয়েছে। জাতিসংঘেও ন্যায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়, এমন পর্যায়ে যে, জাতিসংঘের সাথে নিকট-সম্পর্ক যারা রাখেন তারাও খোলাখুলি এর দুর্বলতাসমূহ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার এর মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জাতিসংঘের সাবেক সহকারী মহাসচিব এ্যান্থনি ব্যানবারি লেখেন:

"জাতিসংঘকে আমি ভালবাসি, কিন্তু এটি ব্যর্থ হচ্ছে। এখানে আমলাতন্ত্র মাত্রাতিরিক্ত আর ফলাফল অতি সামান্য। জাতিসংঘের মূল্যবোধ ও লক্ষ্যকে অনুসরণ বা কার্যক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করে, অনেক বেশি সিদ্ধান্ত কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নেয়া হয় ... জাতিসংঘকে এগিয়ে যেতে ও উন্নতি করতে হলে এর আমূল পরিবর্তন আনতে হবে আর তাই উচিত হবে বহিরাগত কোন প্যানেল যেন এ সিস্টেমটির পর্যালোচনা করে এবং পরিবর্তনসমূহের সুপারিশ করে।"

অনুরূপভাবে, সম্প্রতি কতক সরকার অন্যায় ও বিচক্ষণতাবর্জিত বৈদেশিক

নীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যেগুলো বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপর এক অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। একজন সুপরিচিত কলামিস্ট, পল ক্রুগম্যান, সাম্প্রতিককালে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে লিখেছে:

"ইরাকের যুদ্ধ একটি নিষ্পাপ ভুল ছিল না, এমন এক উদ্যোগ যা এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নেয়া হয়েছিল যা পরবর্তীতে ভুল সাব্যস্ত হয়েছে ... জনসমক্ষে উক্ত আক্রমণের স্বপক্ষে যতগুলো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো বাহানা ছাড়া কিছুই ছিল না, তাও আবার এমন বাহানা যা ছিল সর্বৈব মিথ্যা রটনা।"

যে কারণে আমি এ উদাহরণগুলো পেশ করেছি তা উদ্দেশ্য এটি তুলে ধরা যে, আজ এটি অন্যায্য দাবি হবে যদি বলা হয় যে, বিশ্বে আজ দৃশ্যমান ক্রমবর্ধিষ্ণু সংঘাতের জন্য কেবল মুসলমানেরাই দায়ী। যদিও এটি অনস্বীকার্য যে কতক মুসলিম দেশ আজকের যুদ্ধসমূহ ও নৃশংসতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে, তথাপি এটিও বলা যায় না যে, বাকি বিশ্ব একতাবদ্ধ এবং বিশৃংখলা থেকে মুক্ত।

উদাহরণস্বরূপ, বারংবার এমন প্রতিবেদনসমূহ বা বিবৃতিগুচ্ছ সামনে এসেছে যেগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার দিকে এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনার দিকে ইশারা করে। বস্তুত সম্প্রতি ব্যাপকভাবে এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা বলেছেন যে, এতে "কোন সন্দেহ নাই" যে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্র-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অনুরূপভাবে জানুয়ারিতে, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট পত্রিকা একজন সিনিয়র চীনা সামরিক কর্মকর্তার একটি উদ্ধৃতি প্রকাশিত হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্র-চীন যুদ্ধ এখন আর "কেবল একটি শ্লোগান" নয়, বরং তা ক্রমশ একটি "ব্যবহারিক বাস্তবতা"-তে পরিণত হচ্ছে।

অনুরূপভাবে, রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন সর্বদাই ছাই চাপা আগুনের ন্যায় জ্বলছে আর যেকোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বস্তুত উত্তেজনা যখন বেড়েই চলছিল, জার্মানীর সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টাইনমাইয়ার, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুশ সীমান্তে নেটো-র সামরিক মহড়ার সমালোচনা করেন। গত জুনে এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

"যে একটি কাজ অন্তত আমাদের করা উচিত না তা হল, উচ্চকিত শক্তি-প্রদর্শন ও যুদ্ধংদেহী আচরণের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে আরো উত্তেজিত করে তোলা। ... কেউ যদি মনে করেন যে, (নেটো) জোটের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে সাজোয়াঁ যানের একটি প্রতীকী মহড়া চালালেই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি ভুল করছেন। আমাদের জন্য সদুপদেশ এটাই হবে যে পুরনো এক সংঘাতকে এ মুহূর্তে নবায়ন করার বাহানা তাদের হাতে আমাদের তুলে দেয়া উচিত না।"

আমি এ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির সাথে একম যে, রাষ্ট্রসমূহে একে অপরকে উস্‌কে দেয়া উচিত না, বা তাদের আধিপত্য বিস্তারের। যাহোক, আমি কয়েকটি এমন প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছি যেগুলোতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে আমরা আরো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে আমরা মেরুকরণ ও একে অপরের প্রতি মনোভাবকে কঠোরতর হতে দেখছি। একে অপরকে দোষারোপ করা ও দায়ভার চাপানোর পরিবর্তে, এখন সময় সমাধান খোঁজার। আমার মতে একটি সমাধান আমাদের হাতে প্রস্তুত আছে যার কার্যকারিতা তাৎক্ষণিক হতে পারে এবং যা বিশ্বের এ ক্ষতকে সারিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করবে। এখানে আমি আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাণিজ্যের কথা বলছি, যা আমার মতে সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আমরা সবাই জানি যে, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিদেশে অস্ত্র বিক্রী করছে এবং এতে ঐ সকল দেশও অন্তর্ভুক্ত যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এটি ব্যাপকভাবে সংবাদে এসেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসন সৌদি আরবের নিকট অত্যাধুনিক প্রিসিশন-গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি বিক্রয়ের জন্য নতুন অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। উপরন্তু গত বছর প্রকাশিত জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, অস্ত্র বিক্রয়ের সময় স্বাভাবিক আইনের অনুসরণের কোন পরোয়া করা হয় না। এতে পাওয়া গেছে যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোম্পানি, ব্যক্তি ও দেশ দীর্ঘদিন ধরেই লিবিয়ার উপর আন্তর্জাতিক অস্ত্র অবরোধ লঙ্ঘন করে সেখানকার বিভিন্ন পক্ষকে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে।

আর যেখানে সীমিতভাবে কিছু আইন রয়েছে, সেগুলোও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মানবতার কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সেখানে দুঃখজনক সত্য হল বাণিজ্যিক স্বার্থ ও সম্পদের লিপ্সা বিনা ব্যতিক্রমে এ সকল উদ্বেগের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে সি.এন.এন.-এর একজন বহুলপরিচিত সঞ্চালক সম্প্রতি বলেন, অস্ত্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মার্কিন প্রতিরক্ষা কোম্পানিগুলোতে লোকবল হ্রাস বা চাকুরীচ্যুতি ঘটতে পারে। সরাসরি

সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেন:

“অনেক চাকুরী এখানে হুমকির মুখে পড়বে। এটা নিশ্চিত যে, যদি এ সকল প্রতিরক্ষা কন্ট্রাক্টরদের অনেকেই যুদ্ধ বিমান ও অন্যান্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সৌদি আরবকে বিক্রী করা বন্ধ করে দেয় তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব ও লোকসানের ঘটনা ঘটবে।”

তদুপরি কখনো কখনো এ যুক্তি দেখানো হয় যে, অস্ত্র বিক্রী প্রকৃতপক্ষে শান্তিকে “উৎসাহিত” করতে পারে, কেননা অস্ত্র “ডিটারেন্ট” (অপর পক্ষকে সংঘাত সূচনা করতে নিরুৎসাহিতকারী) হিসেবে কাজ করতে পারে। আমার মতে, এ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বরং তা কেবল অত্যাধিক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র আরো অধিক উৎপাদন ও বাণিজ্যকেই উৎসাহিত করে। নিশ্চিতভাবে, এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শনই বিশ্বকে এক অন্তহীন অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছে। মানবজাতির কল্যাণার্থে সরকারগুলোর এ শংকাকে উপেক্ষা করা উচিত যে, অস্ত্র বাণিজ্য সংকুচিত করলে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বরং তাদের ভাবা মুসলিম দেশগুলোতে, এমনকি দায়েশের ন্যায় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হাতে যে অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তার অধিকাংশই পাশ্চাত্যে অথবা পূর্ব ইউরোপে উৎপাদিত আর তাই এখনই সময় এমনভাবে যথোপযুক্ত অবরোধ আরোপ করার, এবং সেটিকে কার্যকরভাবে বলবৎ করার। যদি এই একটি পদক্ষেপও নেয়া হয়, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে অল্প সময়কালের মধ্যেই এর অত্যন্ত অর্থবহ ফল বয়ে আনবে। অন্যথায় যা ঘটবে তা কল্পনা করা দুষ্কর।

আমার বিষয়টি আরো ভেঙে বলার প্রয়োজন নেই, কেননা যে প্রবন্ধগুলো আমি উদ্ধৃত করেছি সেগুলো নিজেরাই বিষয়টি স্পষ্ট করে এবং আরেকটি বিশাল আকারের যুদ্ধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কোন দেশ বা গোষ্ঠীর এ ভ্রান্তির মধ্যে থাকা উচিত না যে তারা নিরাপদ, কেননা যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তখন সেগুলো দ্রুত এবং প্রায়শ অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়।

যদি আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ফিরে তাকাই, এমন জাতিসমূহ ছিল যেগুলো যুদ্ধে অংশ না নেয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জোট ও ব্লকগুলোতে যখন রদবদল হতে থাকে, তারা এতে জড়িয়ে পড়ে। আজ বেশ কয়েকটি দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র রয়েছে, আর যদি কেবল এমন একটি অস্ত্রও কোন দিন ব্যবহৃত হয়, এর পরিণতি হবে অকল্পনীয়, আর আমরা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পরও যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহের জন্য সমৃদ্ধির এক উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য কেবল দুঃখ-যাতনা রেখে যাওয়ার অপরাধে আমরা দোষী হয়ে থাকবো। বিশ্বের জন্য আমাদের অবদান হবে এক প্রজন্ম প্রতিবন্ধী শিশু, যাদের জন্মই হবে বিকলাঙ্গ অথবা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হিসেবে। কে জানে তাদের দেখাশোনা ও লালন-পালনের জন্য তাদের পিতা-মাতাও বেঁচে থাকবেন কিনা?

সুতরাং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা যে কোন মূল্যে আমাদের নিজ স্বার্থ উদ্ধারে রত থাকি, তবে অন্যদের অধিকার হরণ করা হবে আর এর পরিণাম কেবলই সংঘাত, যুদ্ধ ও দুর্দশা। আমরা যে নীতির উপর দণ্ডায়মান তার বিষয়ে আমাদের পুনরায় চিন্তা ও উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

যেভাবে আমি শুরুতেই বলেছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা আবির্ভূত হয়েছিলেন মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে এক বন্ধন রচনা করতে আর মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করতে, আর তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার দোয়া এটাই যে, আমি দোয়া করি যেন অতিরিক্ত বিলম্ব হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিশ্ব তার সম্বিৎ ফিরে পায়।

আমাদের সন্তানদের উপর আমাদের পাপের ভয়াবহ পরিণতির বোঝা চাপিয়ে না দিয়ে, আসুন আমরা তাদের জন্য আশা ও সম্ভাবনার এক উত্তরাধিকার রেখে যাই।

এ কথাগুলো সাথে, আমি দোয়া করি যেন খোদা তা'লা বিশ্ববাসীর বোধোদয় দান করেন এবং যে কাল মেঘ আমাদের উপর ছেয়ে আছে তা সরে গিয়ে এক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দ্বার উন্মোচন করবে।

মানবজাতির উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। আমীন। সমবেত সকল অতিথিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

Dr. Nazifa's Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka – 1212

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা

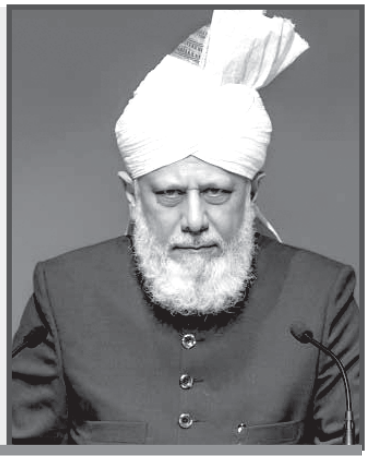

শরীয়তের কতিপয় মৌলিক বিষয় নিয়ে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশনা যা বিভিন্ন সময় এম.টি.এর অনুষ্ঠানে এবং চিঠির জবাবে হুযূর দিয়েছেন। আর তা প্রথমবার সবার সুবিধার্থে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

(ইংরেজি মূল: জহির আহমদ খান, রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তর, লন্ডন)

(অনুবাদ: মওলানা মসীহ্ উর রহমান, ওয়াকফে যিন্দেগী)

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আমীরুল মু'মিনীনের (আই.) সমীপে এক ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের কুরআন স্পর্শ করা এবং কম্পিউটার, আইপ্যাড ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত করা বিষয়ে বিভিন্ন ফিকাহবিদদের উক্তি সম্বলিত তুলনামূলক গবেষণা পত্র পেশ করে হুযূরের সদয় নির্দেশনার অনুরোধ করেন।

হুযূর (আই.) তার ২০১৮ সালের ৫ অক্টোবর লেখা চিঠিতে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন:

"এই বিষয়ে ফিকাহবিদ এবং ইসলামী দার্শনিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। শরীয়তের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গরা কুরআনের ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী এই বিষয়ে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন।"

"পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, মহানবী (সা.)-এর হাদিস এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রায় অনুসারে, এই বিষয়ে আমার মত এটাই যে, মাসিকের সময়ে একজন মহিলা তার মুখস্ত করা কুরআনের অংশ যিক্‌র হিসেবে মৌখিকভাবে পড়তে পারে। এছাড়া যদি গুরুতর প্রয়োজন হয় তাহলে সে পবিত্র ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে কুরআন ধরতে পারে এবং কাউকে রেফারেন্স দেয়ার জন্য অথবা শিশুদের কুরআন শিখানোর স্বার্থে কুরআনের অংশ পড়তেও পারবে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে কুরআন পড়তে পারবেন না।"

"একইভাবে ঋতুস্রাবকালীন সময়ে কম্পিউটার, ইত্যাদি দেখেও কুরআন পড়তে পারবে না, যদিও সে কুরআন শারীরিকভাবে স্পর্শ করবে না। কিন্তু জরুরী ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স খুঁজতে বা কাউকে কোনো রেফারেন্স দিতে সে কম্পিউটারে কুরআন পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই।"

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করা

মহিলাদের ঋতুস্রাবকালীন সময়ে আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে মসজিদে যাওয়া বিষয়ে এক মহিলা বিভিন্ন হাদিস সম্বলিত একটি চিঠি হুযূরের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি ঋতুস্রাবকালীন সময়ে মহিলাদের মসজিদে মিটিং-এ যোগদান করা এবং ঋতুবতী অ-আহমদী মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শনের অনুমতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুযূরের কাছে নির্দেশনার জন্য অনুরোধ করেন।

এই বিষয়ে হুযূর (আই.) তার ২০২০ সালের ১৪ মে-র চিঠিতে নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেন:

"হযরত রসূলে করীম (সা.) মহিলাদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদে কিছু নিয়ে আসা এবং মসজিদে বসা সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। যেহেতু আপনি আপনার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) তার স্ত্রীদের ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে মাদুর বিছাতে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে বসার বিষয়ে হাদিসে হুযুর (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।"

"অতএব, হুযূর (সা.) দুই ঈদের নামাযে অবিবাহিত যুবতী মেয়েদের পর্দা করে ঈদের নামাযে যোগ দিতে এমনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি মেয়েরা ঋতুবতী হয় এবং তাদের কাছে যদি পর্দার ব্যবস্থা না-ও থাকে, তাহলে তারা যেন তাদের বোনদের কাছ থেকে স্কার্ফ ধার নিয়ে ঈদের নামাযে যায়। কিন্তু তিনি (সা.) ঋতুবতী মহিলাদের মূল নামায ঘরের বাহিরে থেকে নামাযের পর দোয়ায় যোগদানের অনুমতি দিয়েছেন।"

"একইভাবে বিদায় হজ্বের সময় যখন সকল মুসলমানরা হজ্বের আগে ওমরা সম্পন্ন করছিল তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঋতুকালীন সময় চলছিল। এই কারণে হুযূর (সা.) তাকে ওমরা করার অনুমতি দেন নি। কেননা ওমরার সময় কাবার তাওয়াফের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মসজিদে থাকতে হয়। যখন হজ্বের পর তার মাসিক শেষ হয়ে যায়, তাকে ওমরার অনুমতি দেয়া হয়।"

"তাই হাদিসে এরকম স্পষ্ট নির্দেশনা থাকায় আমাদের কাছে নতুন কোন পথ নেই যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি।"

"এই ব্যাপারে বাস্তবতা হল, অতীতে অনেক মহিলার কাছে বর্তমানের মতো আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সহজলভ্য ছিল না। এটি সঠিক যে, তাদের কাছে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের সামর্থ ছিল না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তারা একেবারেই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতো না এবং তাদের পোষাক নোংরা হয়ে যেত। মানুষ প্রত্যেক যুগেই তার প্রয়োজন পূরণে সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে নিয়েছে। তাই মহিলারা অতীতেও এবং আজও সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে।"

"অধিকন্তু অবশ্যই বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে। অনেক মহিলা এমন রয়েছেন যাদের রক্তপাত বেশি হয়। যার ফলে 'প্যাডে লিকিংস'-এর কারণে কাপড় রক্তে নোংরা হয়ে যায়।"

"এভাবেই প্রত্যেক যুগে ইসলামের শিক্ষা অনুসৃত হবে আর এই ধারাবাহিকতা চিরস্থায়ী এবং যেভাবে রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে অনুসৃত হয়েছে তেমনি সবযুগেই এই শিক্ষা সর্বজনবিদিত। যদিও কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা রয়েছে যে, নামাযের ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘর নেই। তাহলে এমন কোন জায়গা নির্বাচন করুন যেমন রুমের পিছন দিকে দরজার কাছে যেখানে সাধারণত কেউ নামায পড়ে না। ঋতুবতী মেয়েরা সেখানে বসতে পারেন। অন্যথায় নামাযের জায়গার পিছন দিকে এমন জায়গায় এদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে সাধারণত নামায পড়া হয় না।"

"আর অমুসলিম মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শন করার বিষয়ে মনে রাখতে হবে, প্রথমত তাদেরকে সাধারণত মসজিদে বসানো হয় না বরং তাদের হেটে হেটে মসজিদ পরিদর্শন করানো হয়। আর এই সময়টা ততটাই হয় যতটা মসজিদ থেকে মাদুর আনতে বা মাদুর বিছাতে লাগে। আর যদি তাদের নামাযের জায়গায় বসাতেই হয় তাহলে তাদের নামাযের মাদুরে না বসিয়ে বরং তাদের নামাযের জায়গার শেষে পিছনের দিকে চেয়ারে বসাবেন।"

উপরোক্ত জবাবে হুযূর (সা.)-এর ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের নামাযের দোয়ায় যোগদানের স্পষ্ট নির্দেশনাও হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন।

ঈদের খুতবা শোনা বিষয়ে একই রকম প্রশ্নের জবাবে হুযুর (আই.) হাদিসের আলোকে জবাব দিয়েছেন যা সবার জ্ঞাতার্থে নিচে তুলে ধরা হল।

ঈদের খুতবা শুনা না শুনার বাধ্যবাধকতা

দারকুতনী শরীফের এক হাদিস যেখানে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর (সা.) বলেছেন যে, একবার ঈদের নামাযের পর খুতবার আগে হুযূর (সা.) বলেন, যারা থাকতে ইচ্ছুক তারা থাকতে পারে আর যারা যেতে চায় তারা চলে যেতে পারে। এক ব্যক্তি হুযুর (আই.)-কে জিজ্ঞাসা করেন এই হাদিস ঠিক কি না।

"এই প্রশ্নের জবাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর দেয়া চিঠিতে বলেন:

"আপনি আপনার চিঠিতে দারকুতনীর যে হাদিস উল্লেখ করেছেন সে হাদিস আবু দাউদ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।"

"এটা ঠিক যে, রসূলে করীম (সা.) ঈদের খুতবা শোনার ব্যাপারে ততটা জোর দেন নি। যতটা তিনি জুমুআর খুতবা নীরবতার সাথে শোনার এবং জুমুআর নামায পড়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে ফিকাহবিদরা ঈদের নামাযকে সুন্নত এবং মুস্তাহাব আখ্যা দিয়েছেন।"

"যদিও এর পাশাপাশি সবার মনে রাখা উচিত, হুযূর (সা.) ঈদের নামাযে এবং নামাযের পর দোয়াতে অংশ নেয়াকে বরকতময় পুণ্যকর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (সা.) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যাদের কাছে স্কার্ফ নেই তারা যেন তাদের বোনের থেকে স্কার্ফ ধার নিয়ে ঈদের নামাযে অংশ নেয়। একই সাথে তিনি (সা.) ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশ নিতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তাদের উচিত নামাযের জায়গার বাহিরে অবস্থান করে দোয়ায় অংশ নেয়া।"

বাড়িতে ই'তিকাফ করা

একজন মহিলা রমযানে ই'তিকাফ করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করেন:

"আমরা কি রমযানে নিজ বাড়িতে তিন দিন ব্যাপী ই'তিকাফ করতে পারি?"

হুযূর (আই.) ২০১৫ সালের ৯ আগস্ট দেয়া চিঠিতে নিম্নোক্ত উত্তর দেন:

"হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী রমযানের ই'তিকাফের নিয়ম কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, রমযানে বাড়িতে তিন দিন ব্যাপী ই'তিকাফ করা যাবে না।"

"হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবন থেকে প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) রমযানে কমপক্ষে দশ দিনের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। যেভাবে এই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

নবী (সা.) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। *(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ই'তিকাফ, বাব আল ই'তিকাফি ফিল আশারিল আওয়াখিরি ওয়াল ই'তিকাফি ফিল কুল্লীহা)*

একইভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা রমযান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ই'তিকাফ নিয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন। যেখানে তিনি বলেন,

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থ: তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রী গমন করো না। *(সূরা আল বাকারা: ১৮৮)*

অর্থাৎ প্রথমত, রমজানে ই'তিকাফ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে শারীরিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত, ই'তিকাফের জন্য নির্ধারিত স্থান হল মসজিদ।

ই'তিকাফ শুধুমাত্র মসজিদেই হতে পারে এই ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাই। যেমন,

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا وَلاَ يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لاَ بُدَّ مِنْهُ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ

'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হল, সে কোন রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, সওম (রোযা) না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মাসজিদে ই'তিকাফ করবে। *(সহীহ আবু দাউদ, কিতাবুস সিয়াম, বাব আল মুতাকিফি ইয়ায়ুদুল মারিদা)*

"সুতরাং কুরআন করীম এবং রসূল (সা.)-এর ভাষ্য অনুসারে ই'তিকাফের রীতি হল জামে মসজিদে দশ দিন যাবত ই'তিকাফ করা।"

কিন্তু যদি কেউ রমজানের দিন ব্যতীত অন্য সময় নিজেদের বাড়িতে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে ইবাদত করে এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহলে এটি অবশ্যই ভালো কাজ। এক্ষেত্রে অবশ্যই অনুমতি রয়েছে এবং আমরা এক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা পাই না। এছাড়া কতক ফিকাহবিদ মনে করেন, মহিলাদের জন্য বাড়িতে ই'তিকাফ করা উত্তম। ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব হিদায়া'-তে বলা হয়েছে,

اما المرأة تعتكف فى مسجد بيتها

"এটাই যে, মহিলারা ই'তিকাফ বাসার সেই জায়গায় করতে পারবে, যেখানে তারা নামায আদায় করে।" *[আল-হিদায়াহ ফি শার্হি বিদায়াতিল-মুবতাদি, বাব আল-ই'তিকাফ]*

এই ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:

"مسجد کے باہر اعتکاف ہو سکتا ہے مگر مسجد والا ثواب نہیں مل سکتا"

"মসজিদের বাহিরে ই'তিকাফ হতে পারে, তবে মসজিদের সওয়াবটা পাওয়া যাবে না।" *[আল ফযল, ৬ মার্চ- ১৯৯৬]*

স্কার্ফ পরার সঠিক সময়

২০১৩ সালের ১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ায় 'গুলশানে ওয়াকফে-নও' অনুষ্ঠানে এক মেয়ে হুযূর (আই.)-কে মেয়েদের স্কার্ফ পরার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, জবাবে হুযূর (আই.) বলেন,

"তুমি যখন ৫ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তোমার ফ্রকের নিচে পায়জামা না পরে বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। তোমার পা আবৃত থাকা উচিত যাতে তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারো যে, তোমার পোষাক শালীন হওয়া উচিত। তোমার হাফহাতা ফ্রক পরা উচিত নয়।"

"এরপর তুমি যখন ৬-৭ বছরের হবে তখন তোমার পায়জামার ব্যাপারে আরো সতর্ক থাকা উচিত। আর তোমার বয়স যখন ১০ হবে তখন তোমার ছোট স্কার্ফ পরার অভ্যাস করা উচিত।"

"তোমার বয়স যখন ১১ হবে তখন তোমার রীতিমত স্কার্ফ পরা উচিত। তখন স্কার্ফ পরার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়া উচিত নয়। এমনকি উপমহাদেশীয় মানুষরা এখানে শীতকালেও স্কার্ফ পরিধান করে। তারা কি ঠাণ্ডায় কান ঢাকে না? শুধুমাত্র একটি স্কার্ফ ব্যবহার করে। এভাবে স্কার্ফ পরিধান করো।"

"এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের বয়স ১০ হলেও তাদের দেখতে অনেক ছোট লাগে। আবার অনেকেই আছে যাদের দেখে মনে হবে তাদের বয়স ১২ বছর। যদিও তাদের বয়স মাত্র ১০ বছর। উচ্চতার জন্য তাদের বড় লাগতে পারে। সুতরাং এমন মেয়েরা যাদের দেখতে বড় লাগে তাহলে তার অবশ্যই স্কার্ফ পরা উচিত।"

"যদি তুমি শৈশব থেকেই স্কার্ফ পরার অভ্যাস করে নাও তাহলে তোমার পরে আর লজ্জা লাগবে না। অন্যথায় সারাজীবন তোমার স্কার্ফ পরতে লজ্জা লাগবে। যদি তুমি বলো যে, তুমি যখন ১২-১৪ বছরের হবে তখন স্কার্ফ পরবে তাহলে এই চিন্তা বড় হলেও থেকে যাবে আর পরবর্তীতে লজ্জার কারণে স্কার্ফ পরার মানসিকতাই নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বলবে যে, অন্য মেয়েরা আমাকে উপহাস করবে। আমি যদি স্কার্ফ পরি তাহলে তারা হাসাহাসি করবে।

"সুতরাং এখন থেকেই মাঝে মাঝে স্কার্ফ পরার অভ্যাস করো। ৭-৮ বছর বয়সে তুমি স্কার্ফ পরা শুরু করো এবং অবশ্যই অন্য মেয়েদের সামনে পরা আরম্ভ করো যাতে তুমি আর লজ্জাবোধ না করো এবং যখন তুমি বড় হতে শুরু করবে তখন স্কার্ফ পরিপূর্ণভাবে পরা আরম্ভ করো। ঠিক আছে? তুমি বুঝেছ?

"তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। বড় মেয়েদের এটা অনুধাবন করা আবশ্যক যে, পর্দা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য হল, শালীনতা। যারা পশ্চিমা এবং ইউরোপিয়ান সমাজের প্রভাবে চলে আসে তাদের জানা উচিত, অতীতে এই

মানুষরাও শালীন লম্বা পোষাক পরিধান করতো। তারা সাধারণত লম্বা ঢিলে কাপড় পরতো। এখন তারা নগ্ন হয়ে ঘুরছে।

"সমস্যা হল, তারা মনে করে পুরুষদের ফুল প্যান্ট এবং কোট টাই-তে সুদর্শন লাগে। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তারা বলে থাকে যে, তারা যখন মিনিস্কার্ট পরিধান করে তখন তাদের ভালো লাগে। আমি এই যুক্তি একদমই বুঝতে পারি না।

সুতরাং পুরুষদের কথা ভেববেন না। মনে রাখবেন, যে মহিলারা নিজেদের অনাবৃত রাখে তারা নিজেরা নিজেদের অসম্মান করে। মূলত, একজন আহমদী নারী ও মেয়ের মর্যাদা তার শালীনতার মধ্যে নিহিত। মূল কথাই হল, শালীনতা। একমাত্র নম্রতা, শালীনতাই অন্যদের খারাপ দৃষ্টি থেকে তোমাদের বাঁচাতে পারে।

ফরয রোযা রাখার সঠিক বয়স

২০১৩ সালের ১২ অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় একই 'গুলশানে ওয়াকফে-নও' অনুষ্ঠানে অন্য এক মেয়ে হুযূর (আই.)- কে রমযানে ফরয রোযা রাখার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

জবাবে হুযূর (আই.) বলেন,

"রোযা তখন আপনার উপর ফরয হবে যখন আপনি একদম বড় হয়ে যাবেন। যদি আপনি ছাত্র হন এবং আপনার পরীক্ষা চলছে আর আপনার বয়স ১৩-১৫ বছর হয় তাহলে আপনার রোযা রাখা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যদি রাখতে চান তাহলে ১৫-১৬ বছর বয়সে রোযা রাখা যেতে পারে।"

"কিন্তু যখন আপনার বয়স ১৭-১৮ বছর হবে তখন রোযা আপনার উপর ফরয হবে। তখন আপনার অবশ্যই রোযা রাখা উচিত। কিন্তু আপনি যদি রোযা রাখা পছন্দ করেন তাহলে আপনি এক দু'টি রোযা ৯-১০ বছর বয়সে রাখতে পারেন। যদিও তা ফরয না।"

"রোযা আপনার উপর তখন ফরয যখন আপনি বড় হয়ে যাবেন এবং আপনি রোযা সহ্য করতে পারবেন। অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন ঋতুতে সময়ের পার্থক্য কত? আপনাদের এখানে দিনের আলো কতক্ষণ থাকে? সেহরী এবং ইফতারীর মাঝে সময়ের পার্থক্য কত? ১২ ঘন্টা? গ্রীষ্মের সময় কত? আপনারা কি ১৯ ঘন্টা রোযা রাখেন? হ্যাঁ, তাহলে আপনারা ১৯ ঘন্টা না খেয়ে থাকতে পারবেন না।

গত গ্রীষ্মে ইউ. কে-তে রোযার সময় অনেক বেশি ছিল আর তোমাদের রোযা রাখার সময় কম ছিল। ইউ. কে- তে আমরা সাড়ে ১৮ ঘন্টা রোযা রেখেছি। কিন্তু সুইডেনের মত অনেক দেশে ২২ ঘন্টা রোযা রাখে। যাইহোক আমাদের এই সময় পুনর্বিন্যাস করা দরকার। কেননা কেউ এত লম্বা সময় রোযা রাখতে পারে না। কিন্তু যখন আপনারা বড় হবেন তখন আপনাদের মাঝে সহ্যক্ষমতা তৈরি হবে।

আপনি যখন ১৭-১৮ বছর বয়সে উপনীত হবেন। তখন রোযা রাখলে সমস্যা নেই। তখন আপনার রোযা রাখতে হবে। বুঝেছেন?

তোমার পিতামাতারা কি বলছেন? তারা কি বলছে যে, তোমাদের ১০ বছর বয়সেই তোমাদের উপর রোযা ফরয? যাহোক, তোমাদের নিজেদের অভ্যাস করা উচিত। ছোট বাচ্চাদের প্রতি রমযানেই ২-৩ টি রোযা রাখা উচিত। যাতে তারা রমযানের আগমন উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু যদি আপনারা রোযা না-ও রাখেন তবুও রাতে উঠুন এবং আপনার পিতামাতার সাথে সেহরী খান। নফল পড়ুন এবং নিয়মিত ফযরের নামায পড়ুন।

তোমাদের মত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রমযানে অবশ্যই রাতে উঠা এবং সেহরি খাওয়া উচিত এবং সকল প্রস্তুতির সাথে সেহরীর আগে ২-৪ রাকাত নফল পড়ুন। নিয়মিত ফরয নামায পড়ুন এবং নিয়মিত কুরআন পড়ুন।

https://www.alhakam.org/answers-to-everyday-issues-part-i/

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক- নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

তাঁর সারাজীবন– তাঁর সারা পৃথিবী

মাসুম আহমেদ কুরাইশী

একটি পাহাড়ী ঢল তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোতের তোড়ে কোন কিছু ধরে উদ্ধার পাবারও উপায় নেই। সেই স্রোতের একজায়গায় একজন লোক সেই দৃশ্য দেখে তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন এবং উদ্ধারও করলেন। তাঁর পায়ে ছিল দীর্ঘদিনের একটি ব্যথা। সেই স্রোতের তোড় থেকে উদ্ধার পাবার পর তাঁর সেই ব্যথা চলে গেল, সেই ব্যথার যন্ত্রণা কোনদিন আর তাঁকে সহ্য করতে হয় নি।

একদিন তাঁর পিতা এমনই এক স্রোতের টানে ভেসে এসেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির স্বর্গ বলে অভিহিত সুদূর কাশ্মীর থেকে আমাদের এই বাংলাদেশে– স্বর্গীয় সুধার টানে। তাঁর নাম ছিল কুরাইশী মোহাম্মদ হানিফ। তিনি আমার দাদা। কিন্তু বলতে এসেছি আমার বাবার কথা– কুরাইশী মোহাম্মদ সাদেক তাঁর নাম। একজন অতি সাধারণ মানুষ।

নিজের বাবা যত সাধারণই হন না কেন, সন্তান চাইলে তাঁর বাবা সম্পর্কে অনেক কিছুই লিখতে পারে, তাঁর কিছু সাধারণ কথা -হয়তোবা এরই মধ্য দিয়ে উঠে আসতে পারে অসাধারণ কিছু, বিস্ময় জাগানো কিছু ঘটনা কিংবা জীবনের কিছু আকর্ষণীয় চিত্রকল্প। অশীতিপর একজন মানুষের আদ্যোপান্ত জীবন, একেবারেই কিন্তু সাধারণ নয়।

একজন মানুষের সারাজীবন মানে একজন মানুষের সারা পৃথিবী।

তাঁর জীবনের দিকে একবার চোখ মেলে তাকালে আমরা হয়তো পৃথিবীর একটা সময়ের কিছুটা হলেও দেখতে পাবো। সেই সময়টা, যখন দুনিয়ার তাবৎ মুসলমান দুনিয়াদারীর সবকিছু শেষ করে ভাবে নামায রোযার কথা। অন্যদিকে দুনিয়ার মানুষ ধর্মজগতের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পার্থিবতার মায়া মরীচিকার পেছনে ছুটছে। তাদের এই নিষ্ফল দৌড় থামাতে ডাক দিয়েছেন ইমাম মাহদী (আ.), সঙ্গে তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারী। সমসাময়িক জাগতিক ধ্যানধারণার বিপরীতে লড়াই করে এগুচ্ছেন তাঁরা। বলবো তাঁদেরই দু'একজনের কথা– আমার পিতা বা পিতামহ।

তাঁরা সত্যিকারের ধর্মের অনুসরণ করতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর শিক্ষার আদর্শ অনুসরণ করে ঘরছাড়া হয়েছেন, নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছেন।

আগেই বলেছি, আমার আব্বা কুরাইশী মোহাম্মদ সাদেক, সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু খুব সাধারণ মানুষের জীবনেও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং তা স্মরণ করার দাবি রাখে। আর এ কারণেই আব্বাকে নিয়ে আমার এ লেখা।

আমার আব্বা ছিলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা কুরাইশী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব এবং বাংলাদেশ নিবাসী কারিমুননেসা বিবির বড় সন্তান। তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন আব্বার ছোট ভাই আরিফ কুরাইশী।

আব্বার বাল্যকাল সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমার দাদা কুরাইশী মোহাম্মদ হানিফ, সাইকেল সাইয়্যা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক বলে মনে করছি। তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের আজাদ কাশ্মীরের মিরপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। দাদা স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি বাংলাদেশের একটি গ্রামে বিধবা এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন। তিনি সেই সময় ঐ অঞ্চলের অন্যতম ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁকে আহমদী হওয়ার কারণে খালি হাতেই ঘর থেকে বের হয়ে আসতে হয়। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও ধর্মের সেবক একজন ইসলাম প্রচারক। তাঁর একটি সাইকেল ছিল যে সাইকেলে তিনি বিভিন্ন রকমের ব্যানার, ফেস্টুন, লিফলেট নিজের হাতে লিখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের কথা প্রচার করতেন। এ কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁকে 'সাইকেল সাইয়্যা' বা সাইকেলের বন্ধু উপাধি দেন। এভাবে সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তবলীগ করতে করতে এক সময় তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন ঠিক সেভাবেই ১৯৩৬ সালে বাংলাদেশে এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তারুয়া গ্রামের একজন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। তিনিই ছিলেন আমার দাদী কারিমুননেসা বিবি। বিয়ের কয়েক মাস পরে দাদা বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের রাবওয়ায় চলে যান।

পরের বছর ১৯৩৭ সনে তারুয়ায় আব্বার জন্ম হয়। আব্বার জন্মের কিছুদিন পর দাদী আব্বাকে নিয়ে রাবওয়ায় দাদার কাছে চলে যান। সেখানে বছর খানেক থাকেন। কিন্তু পাকিস্তানে দাদীর মন টিকছিল না, তাই আব্বাকে নিয়ে দাদী বাংলাদেশে চলে আসেন। সেই সময় দাদী গর্ভবতী ছিলেন। বাংলাদেশে আসার পর ১৯৪২ সনে তারুয়ায় তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। দাদী তাঁর ছোট

ছেলের নাম রাখেন আরিফ কুরাইশী। তিনিই আমার চাচা। চাচা বিয়ে করেন মামাতো বোন হেলেনা বেগমকে। চাচার দুই মেয়ে, এক ছেলে। ২০১৬ সনে ৭৪বছর বয়সে চাচা ইন্তেকাল করেন।

আব্বা দ্বিতীয়বার পাকিস্তানে যান ১৯৪৭ সালে এবং দাদা আব্বাকে ওখানেই রেখে দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। তিনি আব্বাকে কুরআন শেখানোর জন্য একজন দরবেশ পীর মনজুর মুহাম্মদ সাহেব যিনি ইয়াস্‌সারনাল কুরআন লিখেছেন তাঁর কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর কাছেই আব্বা কুরআন শিখেন।

দাদার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। তাই মানুষের বাসায় বাসায় গিয়ে কুরআন পড়াতেন, মসজিদে নামাজ পড়াতেন এবং সাধারণ মানুষকে তবলীগ করতেন। যেখানেই রাত হত সেখানেই কারো বাসার বারান্দায় বা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়তেন। গায়ে পরার মতো ভালো কাপড়ও ছিলো না। কেউ যদি কোন কাপড় দিত তাই পরতেন। একবার কেউ একজন আব্বাকে মেয়েদের পোশাক দিয়েছিলেন, তাই পরে আব্বা মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। অবশ্য পরে তা পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, তবে খুব বেশিদিন পড়েন নি। দাদা চাইতেন আব্বা পাকিস্তানেই থাকুক এবং মোবাল্লেগ হন।

আব্বা সবসময় বাংলাদেশে চলে আসতে চাইতেন। এর অন্যতম কারণ ছিল মা কাছে ছিলেন না।

একসময় বাংলাদেশ থেকে রাবওয়ার জামেয়ায় পড়তে যাওয়া মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের সাথে আব্বার পরিচয় হয়। তাঁদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদেরকে বাংলাদেশে আসার ইচ্ছার কথা বলেন এবং এ-ও বলেন যে, দাদা আব্বাকে বাংলাদেশে আসতে দিতে চান না। তাঁরা কোনভাবে আব্বাকে বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থা করে দেন এবং আসার সময় মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব আব্বার হাতে ৫০ রুপী যাতায়াতের খরচও দিয়ে দেন। এখান থেকেই আব্বার বাংলাদেশের যাত্রা।

আব্বা দেশে আসার পর কোন চাকুরী ছিল না। তাঁর হাতের লেখা ছোটবেলা থেকেই অনেক ভালো ছিল। সম্ভবত আমার দাদার কাছ থেকেই পেয়েছেন। তাই বিভিন্ন দোকান, অফিস, মানুষের বাসার সাইন বোর্ড লিখতেন। তখন তিনি বেশিরভাগ সময় তারুয়াতেই ছিলেন। একদিন আমার দাদী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাতায়াতের জন্য কোন পরিবহন ছিল না। আব্বা তখন দাদীকে বাঁশের টুকরীতে বসিয়ে, সেই টুকরী মাথায় করে নিয়ে পায়ে হেঁটে চিকিৎসার জন্য তারুয়া থেকে আশুগঞ্জ নিয়ে গিয়েছিলেন।

দাদীর সাথে আব্বার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আব্বা তখন কাজের জন্য ঢাকায় ছিলেন। হঠাৎ দাদীর শরীর অনেক খারাপ হয়ে যায়। সে সময় আব্বার চাকুরী ছিল না এবং হাতে টাকাও ছিল না। দাদীর চিকিৎসা কিভাবে করাবেন এই চিন্তা নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আব্বার এক পরিচিত লোক তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁকে এভাবে সামনে দেখে আব্বা একটু রাগান্বিত হয়ে বললেন,"ভাই আমার সাথে মশকরা কইরেন না, আমার তাড়া আছে, আমাকে ছাড়েন।" তখন সেই লোকটি পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে আব্বার শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আব্বা বলে উঠলেন ভাই আমার সময় নাই আমি খুব ঝামেলার মধ্যে আছি। কোন কাজ করতে পারব না। লোকটা তখন বললেন, "ভাই যখনই পারেন তখনই কাজটা করে দিয়েন", এই বলে চলে গেলেন।

আমাদেরকে আব্বা প্রায়ই বলতেন, তিনি পরবর্তী জীবনে যা কিছুই অর্জন করেছেন তার পেছনে তাঁর মায়ের দোয়া অনেক বেশি কাজ করেছে।

আব্বা বাংলাদেশে আসার পর এমন অনেক নেক ও বুযূর্গ মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছেন, যাদের প্রভাব তাঁর জীবনে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। তেমনই কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

এই বুযূর্গ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন মরহুম মওলানা আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব। তিনি ছিলেন আব্বার পরম বন্ধু। আব্বা চাকুরীর সুবাদে দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। যখনই দেশে আসতেন, যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন তিনি অবশ্যই মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতেন এবং দীর্ঘক্ষণ একসাথে সময় কাটাতেন।

তারুয়ায় থাকাকালীন প্রায় প্রতিদিনই আব্বা মোল্লা পাড়ার মুনশি ওয়াহেদ উল্লাহ সাহেবের বাসায় যেতেন। মুনশি ওয়াহেদ উল্লাহ সাহেবে ছিলেন আব্বার মামা। একদিন আব্বা বাসায় গিয়ে দেখেন যে, তিনি কুরআন শরীফ সামনে নিয়ে কান্না করছেন। আব্বা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, আল্লাহ্ এতো বড় একটা চিঠি আমাদেরকে দিয়েছেন অথচ এর অর্থই আমি বুঝতে পারছিনা। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন শরীফই আল্লাহ্‌র দেয়া চিঠি।

মুনশি ওয়াহেদ উল্লাহ সাহেবের স্ত্রী জহুরা খাতুন সাহেবা আব্বাকে খুব আদর করতেন। একদিন আব্বা তাঁদের বাসায় যান। তিনি আব্বাকে দেখেই বললেন দেখ, তিনটা শিকায় টাকা রাখা আছে, তোমার কত লাগবে তুমি নিয়ে যাও। আব্বা নিজের হাতে টাকা নিতে রাজি না হওয়ায় তিনি বলেন, আমাকেই যদি দিতে হয় তাহলে আমি দিবো না। এই পরিবারের সবার সাথেই আব্বার আত্মার সম্পর্ক ছিল।

আব্বা যখন রাবওয়া থেকে বাংলাদেশে আসেন সেই সময়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন আমির মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব আব্বাকে ২৫ টাকা বেতনে মোয়াল্লেম হিসেবে চাকুরি দিয়েছিলেন। তিনি আব্বার কুরআন তিলাওয়াত খুব পছন্দ করতেন। তাঁর মেয়ে নাসেরা সাদেক সাহেবার কাছ থেকে শুনেছি, মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব তাঁর ছেলেমেয়েদের কোরআন শেখানোর জন্য আব্বাকে দায়িত্ব দেন এবং এর জন্য একটি মাসোহারা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বুলবুল সাহেবের কাছে আব্বা রং এর কাজ শেখেন। মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব একবার আহমদনগর সফরে গিয়ে আব্বাকে একটা গাছের উপর উঠিয়ে আযান দেওয়ান। আল্লাহ্‌র কি মহিমা, আজ সেই আহমদনগর কত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে।

১৯৬৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সালানা জলসায় আব্বা কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ঠিক তখনই বিরুদ্ধবাদী মোল্লাদের হামলা শুরু হয়। তখন আব্বা মহিলাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

আব্বার কাছে অনেকেই কুরআন পড়া শিখেছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি যারা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জানিয়েছেন। আহমদনগরের মরহুম মওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের বিবি আমাতুস সামী রহমান সাহেবা ও তাঁর বোন, শালসিঁড়ির রাশিদা বেগম পরী আপা, মরহুম মতিউর রহমান সাহেবের বিবি সাদেকা রহমান সাহেবা, মরহুম মওলানা এজাজ সাহেবের মেয়েরা এবং তেজগাঁয়ের ভিজির আলী সাহেবের মেয়েরা ও ডা: আব্দুর রশিদ সাহেবের ছেলেরা। জীবন ও জীবিকার তাগিদে জামা'তের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাটা হয়তো তেমন করে হয়ে উঠে নি আব্বার পক্ষে।

আমরা একটু বড় হয়ে জেনেছিলাম যে, ঢাকা চিড়িয়াখানার ভেতরের পশু পাখিদের খাঁচায় যে সাইন বোর্ড লেখা ছিল বা এখনো কিছু কিছু আছে, তা আমার আব্বার হাতের লেখা।

১৯৬৯ সালে আব্বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইল নিবাসী মরহুম ওলিউর রহমান মোল্লা সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে নুরুন্নাহার বেগমের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তিনিই আমাদের আম্মা। আমরা চার ভাই, তিন বোন।

১৯৭৩ সালে আব্বার বড় বোনের স্বামী তেজতুরী বাজারের বাসিন্দা মরহুম মোহাম্মদ মনিরুল হক সাহেব বাংলাদেশ বিমানে চাকুরীরত ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি আব্বাকে বাংলাদেশ বিমানে চাকুরী দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ বিমানের যে লোগো এখন আমরা দেখি, তা প্রথমে এমন ছিল না। প্রথমে তা ছিলো একটি উড়ন্ত বকের ছবি, যেটা আব্বা লোগো হিসেবে বিমানে এঁকেছিলেন। বাংলাদেশ বিমানে তিনি অনেক বছর কাজ করেছেন এবং যেখানেই কাজ করেছেন সেখানেই তাঁর কাজের প্রশংসা পেয়েছেন ।

১৯৭৯ সালে ওমান থেকে কয়েকজন বিদেশী বাংলাদেশে আসেন এবং আব্বার হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইন্টারভিউর জন্য ডেকে পাঠান। আব্বা ইংরেজী খুব একটা বুঝতেন না বা বলতেও পারতেন না। তাই তিনি তাঁদের সাথে বাংলা ও উর্দুতে কথা বলেন। তাঁরাও পরিষ্কারভাবে তাঁর কথা বুঝতে পারেন নি। তারপরও তাঁরা আব্বাকে ওমানে কাজের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মাকে ছেড়ে তিনি ওমান যেতে রাজি হন নি। পরে তাঁরা বেতন বাড়িয়ে দেওয়ারও প্রস্তাব দেন। তাতেও আব্বা রাজি হন নি ।

এর মধ্যে দাদীর শরীর ভালো না শুনে আব্বা তারুয়াতে চলে যান। মাকে সব ঘটনা খুলে বলেন। সব কথা শুনে দাদী আব্বাকে বুঝিয়ে বলেন যে, দেখ বাবা মানুষের বাঁচা মরা মানুষের হাতে নাই। আমার জন্য চিন্তা করো না, তুমি বিদেশে চলে যাও, তোমার জন্য আমি দোয়া করবো। পরে ওমান থেকে আবার তাঁরা খবর পাঠানোর পর আব্বা সেখানে যাওয়ার জন্য রাজি হন। তাঁরাই পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে দেন। ১৯৭৯ সালে আব্বা ওমানের সিব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গালফ এয়ারে এয়ার ক্রাফ্‌ট পেইন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় যোগ দেন।

১৯৯২ সালে আবুধাবি সরকার আব্বাকে ৬ মাসের জন্য আবুধাবিতে স্পন্সর করে নিয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে ওমান এয়ার চালু হয় এবং এয়ারলাইন্সের প্রথম কাজ তাঁরা আব্বাকে দিয়ে করান। কাজের সম্মান স্বরূপ ওমানের জাতীয় জাদুঘরে আব্বার ছবি লাগানো হয়েছিলো। এক পর্যায়ে তাঁরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সাথেও আব্বার তুলনা করেন এবং তাঁর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন। ইন্টারন্যাশনাল বোয়িং কোম্পানি থেকেও কাজের প্রস্তাব এসেছিল কিন্তু কোন কারণে আব্বা সেখানে যোগ দেন নি।

১৯৯৩ সালে ওমান থেকেই তিনি ইউরোপের দুটি দেশ বেলজিয়াম ও ফ্রান্স সফর করেন। ২০০২ সালে আব্বা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যান এবং হজ্ব পালন করেন। ২০০৪ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পর তিনি জিএমজি এয়ারলাইন্সে যোগদান করেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। এরপর ইউএসবাংলা এয়ারলাইন্স থেকে কাজের প্রস্তাব আসলে তিনি সেখানে যোগ দেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ইউএসবাংলা এয়ারলাইন্সে কর্মরত ছিলেন।

আব্বার ছেলেবেলা রাবওয়ায় কাটানোর কারণে তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারকে খুব কাছ থেকে দেখার। আব্বার কাছ থেকে শুনেছি হযরত আম্মাজান খুব ভাল পায়েশ

রান্না করতেন। বিকালে বাচ্চারা যখন মাঠে খেলতে যেত তখন প্রায় সময় তিনি তাদেরকে ডেকে নিজের হাতে রান্না করা পায়েশ খাওয়াতেন। সেই সুবাদে আব্বারও সুযোগ হয়েছিল আম্মাজানের হাতের পায়েশ খাওয়ার। তাঁর সমবয়সী ও খেলার সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব, যিনি ইমাম সাহেব নামেই সুপরিচিত।

আব্বা খোদ্দাম থাকা অবস্থায় একদিন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাসায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং নির্দেশ ছিল যে, অনুমতি ছাড়া ঘরের ভিতর কেউ যেন না ঢুকে। সেই সময় আল্লাহ্‌রাক্ষা নামের একজন লোক জোর করে ভিতরে ঢুকতে চান। আব্বা তাঁকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তারপরও তিনি কথা শোনেন নি। তখন তিনি লোকটির মুখে ঘুষি মেরে রক্তাক্ত করে তাঁকে নিবৃত্ত করেন।

১৯৬২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন তারুয়ায় আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আব্বা তখন খোদ্দাম ছিলেন। সে সময় হুযূরের সাথে আব্বা এবং আরো কয়েকজন তারুয়া থেকে পায়ে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়েছিলেন।

২০০৪ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগদান করেন এবং দু'বার আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পান। প্রথম সাক্ষাতে আব্বা আবেগে হুযূরের সাথে কথা বলতে পারেন নি। পরে মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব এবং মওলানা আহমদ তারেক মোবাশ্বের সাহেব আব্বাকে দ্বিতীয়বার সাক্ষাত করিয়ে দেন। তখন হুযূর 'আপ ফের আগায়ে' বলে হাসতে থাকেন। তখন আব্বা বলেন, আবেগাপ্লুত হবার কারণে প্রথম সাক্ষাতে কথা বলতে পারি নি, তাই আবার আসলাম।

আব্বা খুবই পরিশ্রমী ও কর্মঠ একজন মানুষ ছিলেন। নিজের কাজ সবসময় নিজে করতেই পছন্দ করতেন। তাঁর হাঁটার খুব ভাল অভ্যাস ছিল। তিনি লন্ডনের ফযল মসজিদ থেকে পায়ে হেঁটে মর্ডেনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে যান, যার দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার। ৫৯ বছর বয়সে তিনি সাইকেল চালিয়ে ঢাকা থেকে তারুয়া সফর করেন। বাংলাদেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। আব্বা এবং আমার মেঝ ভাই দু'জন দু'টি সাইকেল নিয়ে ফজরের নামাজ পড়ে তারুয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং মাগরিবের সময় গিয়ে তারুয়ার মসজিদের সামনে পৌঁছান। এত বড় সফর করেও তাঁর মধ্যে কোন ক্লান্তি ছিল না ।

আব্বার সবচেয়ে বড় যে গুণটি আমি ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছি তা হল, তাঁর আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। আমার দাদার তিন বিয়ে এবং দাদীর এটা দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। দাদার অন্য দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিলেন পাকিস্তানের এবং অন্যজন ছিলেন ভারতের উড়িষ্যার। উড়িষ্যার দাদীর সম্ভবত কোন সন্তান ছিল না।

পাকিস্তানের দাদীর এক ছেলে সাঈদ কুরাইশী চাচা ও এক মেয়ে জাকিয়া বেগম ফুফুর সাথে আব্বার ও আমাদের সবসময় যোগাযোগ ছিল। ২০০৬ সালে সাঈদ চাচা রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন। জাকিয়া ফুফু দুই ছেলেসহ একবার বাংলাদেশেও আসেন। চাচা মারা যাওয়ার পরেও তাঁর পরিবারের সাথে আব্বার যোগাযোগ ছিল। কাদিয়ানে দাদার ছোট ভাই দরবেশ কুরাইশী মোহাম্মদ ফজলুল হক সাহেবের বংশধররা রয়েছেন। ব্যস্ততা ও দূরত্বের কারণে আব্বা সবসময় তাঁদের সাথে যোগাযোগ না রাখতে পারলেও আমাদের মাধ্যমে তাদের খোঁজ খবর নিতেন।

আমার দাদীর প্রথম পক্ষের এক মেয়ে ছিল। তাঁর নাম ছিল রেজিয়া বেগম। আব্বা ও আমাদের সাথে ফুপুর সম্পর্ক ছিল খুবই নিবিড়। ফুপু আমাদের ভীষণ আদর করতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ঢাকার পূর্ব তেজতুরী বাজারের জনাব মোহাম্মদ মনিরুল হক সাহেবের সাথে, যার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আব্বা ও ফুপু পরস্পরকে এতটাই ভালবাসতেন যে, আমরা কখনো বুঝতেই পারি নি তিনি আমাদের আপন ফুপু নন। আব্বা তাঁর ভাগ্নে ভাগ্নিদেরও অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং আমাদেরকে সবসময় বলতেন যেন আমরাও তাঁদের সাথে ভাল সম্পর্ক রেখে চলি।

আহমদীয়াতের কারণেই হয়তো দেশ ও দেশের বাইরে বসবাসরত আমাদের দাদার বংশের সব চাচা-চাচি, ফুপা-ফুপু এবং ভাই-বোনদের সাথে আমাদের এখনো সম্পর্ক রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদের মেহরাবে লিখিত সর্বপ্রথম ক্যালিগ্রাফি কলেমা আব্বার হাতের লেখা। পরবর্তী সময়ে যখন কলেমাটি সিমেন্টের গাঁথুনীতে লেখা হয় তখন লেখার ধরণে কিছুটা পরিবর্তন হয়। বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব আব্বাকে দিয়ে জামা'তের অনেক মসজিদে কলেমা লিখিয়েছেন ।

২০০৮-২০১৬ পর্যন্ত আব্বা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর-এর সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন এবং ৩ বছর মিরপুরের গাবতলী হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০২০ সালের ৯ জুন ৮৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সবশেষে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে চাই লে. কমান্ডার জাফর আহমদ (অব:) সাহেবকে, যিনি এই লেখাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমার পরম সহায় হয়েছেন। ধন্যবাদ আপনাদেরকেও আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সফল করার জন্য।

রহমতুল্লিল আলামীন খাতামান নবীঈন (সা.)

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

আল্লাহ্ পাক স্বরূপে নিজের রঙে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর এই রং তথা গুণাবলী ধারণ করার ক্ষেত্রে মানুষের জন্য যেটুকু সম্ভব তার পরিপূর্ণ এবং সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধারণ করেছেন। এর বাইরে কোন সীমা বা মোকাম নেই, এরপর রবুবিয়ত। রূপক ভাবে আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বাধীনে আঁ হযরত (সা.) তা-ও লাভ করেছেন তবে তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার ফলেই তা লাভ হয়েছে। নবীগণ মানব জাতীর জন্য আদর্শ হয়ে থাকেন, আর এই আদর্শের পরিপূর্ণতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। আদম (আ.) হতে যত নবী রসূল এ ধরাধামে মাঝে এসেছেন তারা কেউ-ই সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আদর্শরূপে পরিপূর্ণ ছিলেন না। তাঁরা সবাই নিজ নিজ গোত্র, জাতী এবং দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কেবল মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) রহমতুল্লিল আলামীন রূপে (২১:১০৮) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শনের জন্য এমন কোন ক্ষেত্র বাকী নেই যা প্রদর্শনের জন্য মৌলিক নীতি ও অবকাঠামোগত আদর্শ মহানবী (সা.)-এর আনীত শিক্ষায় অপূর্ণ রয়ে গেছে। সর্বশেষ সীমা এবং সর্ব নবুওয়্যত পরিবেষ্টনকারী চিরস্থায়ী শিক্ষা নিয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবির্ভূত হয়েছেন, অন্য কথায় তিনি (সা.) খাতামান নবীঈন ও রহমতুল্লিল আলামীন। এই জন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীনরূপে মনোনীত করিলাম (৫:৪)।" এক কথায় ধর্মের মৌলিক নীতি ও আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সুসম্পন্ন ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, "তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুকরণ কর। আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন (৩:৩২)। "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে (৩৩:২২)।"

এখন আল্লাহ্‌র কথাকে দিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে চাই মুসলমানরা কি আজ সে উত্তম আদর্শের অনুসরণ করছে? যদি তাই হতো তবে সন্ত্রাস, রাহাজানী নৈরাজ্য কোথা হতে আসে। মসজিদ মন্দির ধ্বংস করা কি ইসলামের আদর্শ? জোরপূর্বক ধর্মকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কি ইসলামের আদর্শ? পাকিস্তান আজ আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণা করছে, তারা কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ ও পবিত্র কুরআনের নীতিকে অনুসরণ করে আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণা করেছে? তারা ইসলামী আদর্শ-জলাঞ্জলী দিয়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে আহমদীদের অমুসলমান ঘোষণা করেছে। তাহলে তারা যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তথা পবিত্র কুরআনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে তার প্রমাণ কি? হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলে ঘোষণা করেছেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ ও পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ সমর্থন যে তাঁর (আ.) সঙ্গে আছে তা-ও প্রমাণ করেছেন। তদুপরি আল্লাহ্ পাকের শত শত নিদর্শন তাঁর (আ.) স্বপক্ষে বিদ্যমান রয়েছে এবং আজও অব্যাহত আছে। তিনি (আ.) তো রসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর খাঁটি উম্মত এবং তার পূর্ণাঙ্গীন অনুসারী। যেমন করে আল্লাহ্ পাকের সিফত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওপর কার্যকর হয়েছে সেরূপে তিনি (আ.) রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) রঙ্গে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার ফলেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে উম্মতি নবীর পদ দান

করেছেন। প্রকৃত নবুওয়্যত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর-ই। তিনি (আ.) তাঁর (সা.) দাস মাত্র। অপর পক্ষে আহমদীদের বিরোধীরা কি করছে? মিথ্যা বানোয়াট, যুলুম নির্যাতন করে নিজেদের মনগড়া ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আহমদীদের চরম বিরোধিতা করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র সাহায্য কার পক্ষে তা কেন তারা দেখছে না। "পরিতাপ! বান্দাদের জন্য তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নি যার প্রতি তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে নি (৩৬:৩১)। নবুওয়্যত বলতে তাদের মতে নূতন শিক্ষা, শরীয়ত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করা, অথচ পবিত্র কুরআন প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এবং একে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেছেন। উম্মতি নবীর সঠিক ধারণা তাদের নেই। তবে তারাও বিশ্বাস করেন, ঈসা (আ.) আসবেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হয়ে যাবেন এবং ইসলামকে সারাবিশ্বে বিজয় করবেন। ভুল ব্যাখ্যার ফাঁদে পড়ে খাতামান নবীঈন সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ জলাঞ্জলী দিয়ে দাজ্জালের প্রতারণায় তারা তার প্রভুত্ব ও দাসত্ব স্বীকার করে তাদের (দাজ্জালের) স্বপক্ষেই খাতামান নবীঈন (সা.)-এর অবমাননা ও ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম করছেন। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, মূল সংস্কারককে তারা অস্বীকার করছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত নবুওয়্যতের আদর্শ ও শিক্ষাকে হারিয়ে ফেলা হয়েছে। (হাদীসে আছে কুরআন একদিনে আকাশে উঠে যাবে কেবল তার অক্ষরগুলো বাকী থাকবে) সেই নবুওয়্যতের শিক্ষাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন পুষ্ট ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন। "বরং আমরা সত্যকে বাতিলের ওপর ছড়িয়ে মারি ফলে তা এটির মাথা ভেঙে ফেলে এবং দেখ! সহসা এটি বিলীন হয়ে যায়। (২১:১৯)।" মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রেরণ করে আল্লাহ্ পাক ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে দাজ্জালকে (দাজ্জালীয় মতবাদকে) বধ করেছেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে এ আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে সত্য বুঝার এবং মানার সামর্থ দান করুন এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাতলে সমগ্র বিশ্বকে সমবেত করার তৌফিক দান করুন এবং ইসলামের বিশ্ববিজয় দ্রুততর হোক, আমীন।

কবিতা

আযানের ধ্বনি

আনহার বেগম (পারভিন)

তোমার আযান শুনে আমার প্রাণ হয় মুখরিত
কণ্ঠ যেন তোমার কি অবাক কত লাগে সুললিত।
আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর
যার মানে তুমি মহান হে খোদা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ।
স্বর্গের ধনে ধ্বনি কর যত আমার প্রিয়জন
এ আযানের নামাযে হও তুমি সবার আপন।
এই কণ্ঠের আযান শুনে দোয়ায়ে বলি
হে আল্লাহ্ প্রভু আমার তুমি অতিব পবিত্র।
করি স্মরণ রসূল (সা.)
এর হয়ে অতি উত্তম গোত্র
নামাযে আস নামাযে আস আরবি শব্দ হল
হাইয়্যালাস্ সালাহ্ হাইয়্যালাস্ সালাহ্,
তোমার আযান শুনে আমার প্রাণ হয় মুখরিত
কণ্ঠ যেন তোমার কি অবাক কত লাগে সুললিত।
আযানের গুণে তুমি থাক বহুদিন বেঁচে
মরে গেলেও এই আযান যেন বেজে ওঠে আমার কর্ণপাতে,
যদি জানতো সবাই আযানে কি আছে পুণ্য
সব কর্ম রেখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত আযানের জন্য,
এক আদি কালে হযরত বেলালের ছিল আযানে প্রাধান্য
এ কালে তোমার আযান আমাদের মাঝেও এক অনন্য,
সাধে কি হয়েছে এর নাম আযান
এর প্রকৃত ধ্বনি শুনে মানব হয়েছে নাজাত।
হে নূর আহমদ তুমি নূরে নূরান্বিত
তোমার সততা ও সুর আমাদের করে মুগ্ধ,
তোমার আযান শুনে আমার প্রাণ হয় মুখরিত
কণ্ঠ যেন তোমার কি অবাক কত লাগে সুললিত।

[ছোট ভাই নূরকে উপহার]

***

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

শুশ্রূষা শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. **(Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200**
২. **Chelidonium Q (Mother tincture)**

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

New Vol. No. 83 | 24th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

30th June, 2020 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

Hakim Water Technology & Filter House
Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

DRINKING WATER PLANT (INDUSTRIAL)

DRINKING WATER PURIFIER (HOUSEHOLD)

OUR SERVICES:
Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming /hakimwatertechnology

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)